কিশোর ভারতী

বিশেষ পৌষালী সংখ্যা

সপ্তম বর্ষ • চতুর্থ সংখ্যা

পৌষ ১৩৮১ ।। জানুয়ারী ১৯৭৫

সম্পাদক

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান - দেবাশিষ রায়

এডিট - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার কোন স্পেসাল ইস্যু থাকে এবং আপনি সেটা যদি স্ক্যান করে দিয়ে আমাদের প্রজেক্টকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

বিদ্যোদয়ের কিশোর-সাহিত্য

শিবরাম চক্রবর্তীর হাসির গল্পের সঙ্কলন

চোরের পাল্লায় চকর্‌বর্‌তি ৩·৫০ ।। আমার ভালুক শিকার ৩·৫০

রোমাঞ্চকর বিজ্ঞান-নির্ভর উপন্যাস

ভয়ঙ্কর সেই মানুষটি ৩·৮০ সমরজিৎ কর ।। **বিজ্ঞানের দুঃস্বপ্ন** ৩·০০ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপকথা ও রূপকথাধর্মী গল্প ও উপন্যাস

নাবিক রাজপুত্র ও সাগর রাজকন্যা ২·৫০ সঞ্জয় ভট্টাচার্য ।। **চীনের উপকথা** ৩·০০ শ্রীজয়ন্তকুমার
কঙ্কাবতী ৪·২০ ত্রৈলোকানাথ মুখোপাধ্যায় ।। **আলি ভুলির দেশে** ৩·৫০ সুখলতা রাও

সামাজিক উপন্যাস

পরিবর্তন ৪·০০ মনোরঞ্জন ঘোষ

হাসির গল্প

স্বপনবুড়োর কৌতুক কাহিনী ৩·৫০ স্বপনবুড়ো

প্রাচীন ভারতের গল্প

গল্পময় ভারত (১ম খণ্ড ৩·৫০ ২য় খণ্ড ৩··৫০) সুশীল জানা

ভ্রমণ-কাহিনী

সুন্দরবনের চিঠি ২·০০ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রামাণ্য ও জীবন্ত ইতিহাস

ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ২৩·০০ সুপ্রকাশ রায়
অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম : ১ম খণ্ড ১৩·৫০ অনন্ত সিংহ ।। **বিপ্লবের সন্ধানে** ১৬·০০ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস : ১ম খণ্ড ২৪·০০ সুপ্রকাশ রায়

সাহিত্যের ইতিহাস

এশিয়ার সাহিত্য ৩৪·০০ নিখিল সেন ।। **শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য** ১২·০০ খগেন্দ্রনাথ মিত্র

মোহিতলাল মজুমদারের চিরস্থায়ী প্রবন্ধ-সম্ভার

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র ১৪·৫০ ।। কবি শ্রীমধুসূদন ১৪·৫০ ।। বঙ্কিম-বরণ ৮·০০
সাহিত্য-বিচার ১০·৫০ ।। সাহিত্য-বিতান ৬·০০ ।। বাংলার নবযুগ ১০·০০

●পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক জেলা-বোর্ডসমূহের জন্য মাসিক কিশোর-পত্রিকারূপে অনুমোদিত
[২৯.৩.৭৪ তারিখের ১২৪ (১৬) টি. বি. সি. / ২এ-১টি/৭৪ নং সার্কুলার দ্রষ্টব্য]
●পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত। [১৭.৩.৭২ তারিখের টি. বি. নং ৩ দ্রষ্টব্য।]
●আসাম শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক স্কুল লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত। [২.৭.৭১ তারিখের ই জি/এম আই এস সি/২৩/৭০/৩২/(এ) নং মেমো দ্রষ্টব্য।]
●পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক স্কুল লাইব্রেরীসমূহের ব্যবহারের জন্য ও প্রাইজ-পুস্তক হিসাবে সুপারিশকৃত। [২৫.৯.৬৯ তারিখের ২২/৬৯ নং সার্কুলার দ্রষ্টব্য।]

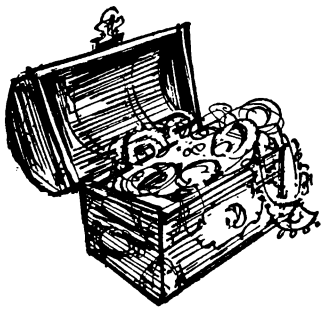

'পত্র ভারতী'র প্রকাশনায়

কিশোর ভারতী

সপ্তম বর্ষ ঃঃ চতুর্থ সংখ্যা
পৌষ ১৩৮১ ॥ জানুয়ারী ১৯৭৫

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়
আমরা বাঁচবো কি করে ? ২৩৬
ব্যাটে-বলে আলোড়িত সম্পূর্ণ উপন্যাস * চরিতার্থ তারুণ্য-স্বপ্নের
ম্যান অব্ দি ম্যাচ—অরুণ আইন ... ২৮৫
সম্পূর্ণ অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস * উৎকণ্ঠা-উত্তেজনা-শিহরণের
সোনাচরে সোনাচোর—অশোককুমার সেনগুপ্ত ২৬১
হর্ষবর্ধনের গল্প
হর্ষবর্ধনের কিরিকেট—শিবরাম চক্রবর্তী ২৫০
উপন্যাসোপম বড় বাংলাদেশের গল্প
সোনালী মাটির দুঃখ—কমলেন্দু ভট্টাচার্য ২৩৮
করুণ-মধুর গল্প
দুর্দিনের সঙ্গী—মোহাম্মদ নাসির আলী ২৫৩
সংগ্রামী মহাজীবনের গল্প
দুঃখজয়ী তরুণ—রবিদাস সাহারায় ২৮৩
জীবজগতের গল্প
বাইসনের বনে—সঙ্কর্ষণ রায় ২৪৩
কবিতাগুচ্ছ
চলচ্চিত্র চতুর্দশী—বিমলচন্দ্র ঘোষ ২৫৯
সেই খুশি নেই আর—বিশ্বপ্রিয় ২৬০
স্বপনতরীর দেশ—বারীন বসু ২৫৯
ছড়া—প্রমোদ সাহা ২৬০
ক খ গ—রঞ্জনপ্রসাদ ২৬৭

EVERY FORTNIGHT
NEW EXCITEMENT STRIKES!

PHANTOM MANDRAKE FLASH GORDON

WAR HEROES: FREEDOM FIGHTERS: MYTHOLOGICAL SAGAS...

...And a host of other super characters...stories! follow their adventures in Indrajal Comics!

Come, enter the exciting, fun filled world of Indrajal Comics, with characters and stories to keep you spell-bound for hours. These lavishly illustrated, full-colour comics come to you for just Re. 1/- a copy and are available in English, Hindi and Bengali.

Remember, it's a new adventure experience every fortnight—so don't miss out on the fun.

Indrajal Comics

A Times of India Publication

FOCUS-B C.39

ধাঁধা-হেঁয়ালি—পরিচালক : অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
নতুন শব্দ-হেঁয়ালি ৩০৪
গত অক্টোবর ১৯৭৪ সংখ্যার শব্দ-হেঁয়ালির উত্তর ও নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম ৩০৫
বইয়ের দুনিয়া—পরিচালক : নিরাপদ রায়
পুস্তক-সমালোচনা বিভাগ ৩০৩
বিজ্ঞানীর দপ্তর—পরিচালক : কিশোর বিজ্ঞানী
টায়ার-সার—ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩০৬
নতুন ধরনের প্লাস্টার ৩০৬
তুষ থেকে ইট !—বগলা যোগশর্মা ৩০৬
জাল ধরার মেশিন ,, ৩০৭
ঝালাই-এর পরিবর্তে আঠার ব্যবহার—নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০৭
এই আধারে
ব্যায়াম—মঞ্জিল সেন ৩০৮
বিবিধ
লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী ২৩১
সওয়াল-জবাব : বাণী মৌলিক
প্রশ্নোত্তর-বিভাগ ৩১১

বর্তমান সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যা বলে ধারাবাহিক কোন লেখা বা ছবি (যেমন 'সবহারাদের ঘর' ও 'অধ্যাপক ত্রিবেদী ও ডাঃ সাটিরা') এই সংখ্যায় গেল না। আগামী সংখ্যা থেকে আবার যথারীতি ওগুলি প্রকাশিত হবে॥

সম্পূর্ণ চিত্র-কাহিনী * সংঘাত-শিহরণের
ইতিহাসে দ্বৈরথ—নারায়ণ দেবনাথ ২৯৫
সম্পূর্ণ চিত্র-কাহিনী * যুগলমূর্তির বিচিত্র কর্মের
নন্টে আর ফন্টে—নারায়ণ দেবনাথ ৩০১
সগল্প চিত্র
অরণ্যের অন্তরালে—ময়ূখ চৌধুরী ২৫৮
প্রচ্ছদ
শিল্পী সূর্য রায়

মূল্য : এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

কিশোর ভারতী কার্যালয় ॥ ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯
বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ ॥ ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯
এবং বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত **বইয়ের দোকান ও পত্রপত্রিকার স্টল**

'পত্র ভারতী'র পক্ষে দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত এবং অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

আমরা বাঁচবো কি করে ?

স্নেহের বন্ধুগণ, কোন্ কথা আজ তোমাদের কাছে বলবো, বুঝতে পারছি নে। শুনে তোমরা হয়তো তাজ্জব বনছো, ভাবছো—সর্বনাশ, সম্পাদক বন্ধুর বলার কথা কি তাহলে সব ফুরিয়ে গেল !

উঁহুঁ, তা নয়, ওরকম মাথায় হাত-দেওয়া ব্যাপার মোটেই নয়, বরং ঠিক তার উল্টো। তোমরা জান কিনা জানি নে, সময় সময় এমন হয়, যখন চারপাশে ছোট-বড় এত অসংখ্য ঘটনা ঘটতে থাকে এবং আমাদের জীবনে তাদের প্রভাব হয় এতই গভীর যে, ও সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে ঘটনাগুলো সব একসঙ্গে এসে ভিড় করে দাঁড়ায়, প্রত্যেকেই তখন চায় তার কথা আগে বলা হোক। তার ফলে বাধে মহা ফ্যাসাদ, কোন কথাই যেন আর ঠিকমতো গুছিয়ে বলা হয়ে ওঠে না। বর্তমান অবস্থা অনেকটা সেইরকম আর কি !

আজকের অবস্থাটা কি ? কিসের সঙ্গে এর তুলনা করা যায় ? এ যেন অসংখ্য বিষধর সাপের এক ভয়ঙ্কর গোলকধাঁধা। সাপগুলো অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছে আর কিলবিল করছে। তাদের ল্যাজামুড়ো বা লেজ-মাথা কোনটাই দেখা যায় না, কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ তাও বোঝার উপায় নেই—মিলেমিশে সব যেন একাকার। এই সব কালনাগের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে আবহাওয়া আজ প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে, আর দম-বন্ধ করা সেই গোলক-ধাঁধার মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে আমাদের—দেশের অগণিত খেটে-খাওয়া মানুষদের।

বন্ধু, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা আজ বড় কঠিন ও জটিল—বিশেষ করে আমাদের মতো গরিব দেশগুলোতে। না, শুধু কঠিন ও জটিলই নয়, অতি করুণও বটে। কাল-সাপজাতীয় অগুনতি সঙ্কটের ছোবলে ছোবলে তা জেরবার জরাজীর্ণ। সঙ্কট আর সঙ্কট ! বিভিন্ন জাতের কত যে সঙ্কটের গোলকধাঁধা জীবনকে আজ নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে, তার মোটামুটি এক হিসাব দিতে গেলেও অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারত বোধহয় হার মেনে যাবে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, পারিবারিক—কত না অসংখ্য রূপ নিয়ে তারা আমাদের জীবনের তটভূমিকে দুরন্ত আঘাতে আঘাতে অবিরত ক্ষয় ও জীর্ণ করে চলেছে। সর্বগ্রাসী এ ভাঙন থেকে রেহাই পাওয়া সাধারণ মানুষের আজ সাধ্যাতীত।

এইসব সঙ্কটের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটই সর্বপ্রধান। এই দুই সঙ্কটকে কেন্দ্র করে ও ভিত্তি করে আর সব সঙ্কট ঘুরপাক খাচ্ছে। আর তারা সবাই মিলে আজ যে দুর্বার ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করেছে, তার কবলে পড়ে আমাদের জীবন-ঘুড়ি কেবলই গোত্তা খেয়ে চলেছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে কত না অসংখ্য জীবন অকালে মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়ছে, আর উঠছে না !

দেশের আজ কি সাংঘাতিক দুঃসময়—কল্পনা করা যায় না ! ভাষাও এখানে মূক। মানুষের অন্তরাত্মা বিদীর্ণ করে একটাই শুধু আর্ত জিজ্ঞাসা আজ যেন অন্তিম কান্নার মতো আকাশে উঠছে—আমরা কি করে বাঁচবো ? কোথায় এর শেষ, কি-ই বা ভবিষ্যৎ ?

সত্যি, মানুষের আজ আর কোন জিজ্ঞাসা নেই, শুধু ঐ একটাই জিজ্ঞাসা—দুবেলা দুমুঠো খেয়ে পরে মাথা গুঁজে বেঁচে থাকার আকুলতা। ভবিষ্যতের স্বপ্নসাধ ও রঙিন আশা কোন্‌কালে তাদের উবে গেছে ! এখন আর কিছু নয়, স্রেফ ঐ প্রাণধারণের আকুলিবিকুলি।

কিন্তু কার কাছে এই জিজ্ঞাসা ? শাসকগোষ্ঠীর কাছে নিশ্চয়ই নয়। জনসাধারণ জানে, এ প্রশ্নের সত্যিকার জবাব দিতে তারা অক্ষম। না, শুধু অক্ষমই নয়, তারা মিথ্যাচারী—চূড়ান্ত অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ। গত ২৮ বছর ধরে অসংখ্য মিথ্যা স্তোকবাক্যের জাল বুনে বুনে তারা দেশকে বর্তমান অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে। তাদেরই শাসনের ফলে সাধারণ মানুষের সমাজ আর ছোটখাট ও মাঝারি ব্যবসাপত্র আজ বিপর্যস্ত ধ্বংসপ্রায়—মৃত্যুপথযাত্রী জনসাধারণ অভাবে অনটনে ও অনাহারে ধুঁকতে ধুঁকতে অতলস্পর্শী অন্ধকার খাদের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, সামনের পথ বন্ধ ; আর অন্য দিকে মৃত্যু-ব্যবসায়ী মুষ্টিমেয় ধনিককুল এবং তাদের পেটোয়া আমলা ও অধঃপতিত রাজনীতিকরা হিমালয়সমান ঐশ্বর্য-সম্পদের স্বর্ণচূড়ায় সমাসীন।

তাহলে কে দেবে এর জবাব ? বর্তমান শাসকগোষ্ঠী-বিরোধী পঞ্চাশমিশুলী দক্ষিণ ও বামপন্থী দলগুলো ? কিন্তু কি জবাব তারা এ পর্যন্ত দিয়েছে বা এখনো দিচ্ছে ? সত্যি কথা বলতে কি, তারা যা বলছে তার বেশির ভাগই শাসককুলের মতো স্তোকবাক্যে ভরা—সেই থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়। সে জবাবে সত্যিকার কোন

মৌলিক সমাধান নেই, আছে সুবিধাবাদ আর গোঁজামিল —মন্ত্রিত্ব-লাভের দুরন্ত কামনা থেকে যার উদ্ভব। বর্তমান অর্থনৈতিক তন্ত্র আর আমলাতন্ত্র, প্রচারযন্ত্রাদি সমেত যাবতীয় রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা মোটামুটি যেমন আছে তেমনিই থাকবে, আর বিরোধীরা কিনা গদিতে বসলেই কোন্ এক যাদুমন্ত্রবলে চরিত্র সব পাল্টে যাবে এবং সুদিন এসে ভর করবে আমাদের ঘাড়ে—এটা জনসাধারণ আজ আর বিশ্বাস করতে রাজী নয়। অতীতে তারা দেখেছে এবং এখনো দেখছে, এইসব বিরোধী দলের অনেকেই কোন-না-কোন সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে মন্ত্রিত্বের গদিতে আসীন হয়েছিল এবং এখনও আছে, কিন্তু তার ফলে প্রকৃত কোন্ স্থায়ী মঙ্গলসাধন হয়েছে সাধারণ মানুষের—একমাত্র সস্তা ফাঁকাবুলি আর তড়পানি ছাড়া।

তাহলে উপায়? ও জিজ্ঞাসার কি তাহলে কোন জবাব নেই? না বন্ধু, যতটুকু দেখছি ও বুঝছি, বর্তমানে ওর জবাব মিলবে না। কিন্তু তাই বলে একেবারে হতাশ হবারও কারণ নেই। আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু, ভবিষ্যতে জবাব একদিন মিলবেই। আজ আমাদের এই যে বাঁচার ব্যাকুলতা ও সংগ্রাম, এরই মধ্য থেকে নিঃসন্দেহে একদিন বেরিয়ে আসবে সেই ইস্পাত-কঠিন মানুষের দল, যারা দেবে সত্যিকার জবাব আর দেখাবে সত্যিকার সমাধানের পথ। কে বলতে পারে, হয়তো সে দলের মধ্যে তোমরাও অনেকে থাকবে! অতএব নৈরাশ্যের কারণ নেই: জনসাধারণ অমর, শেষ লড়াইতে জয় তার অবধারিত—এটা ঐতিহাসিক সত্য।

আজ এই পর্যন্ত। তোমরা সবাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্নেহাশিস গ্রহণ করো। ইতি—

তোমাদের **সম্পাদকবন্ধু**

কিশোর ভারতীতে লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

১. কিশোর ভারতীতে নকল রেখে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়, কারণ কোন অবস্থাতেই প্রাপ্ত রচনা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং লেখার সঙ্গে লেখা ফেরত পাবার উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাবার কোন প্রয়োজন নেই।

২. কিশোর ভারতীর জন্য প্রতিদিন বিপুল পরিমাণে লেখা আসে এবং প্রত্যেকটি রচনাই বিশেষ যত্নসহকারে পড়ে দেখা হয়। স্বভাবতই লেখার ফলাফল নির্ধারণে বেশ সময় লাগে। এই সময়ের হার গদ্যরচনার (গল্প-উপন্যাস-নিবন্ধ ইত্যাদি) ক্ষেত্রে অন্যূন দুই মাস ও ছড়া-কবিতা-লিমেরিক ইত্যাদির ক্ষেত্রে এক মাস।

৩. সাদা কাগজের এক পিঠে সুস্পষ্টভাবে লিখে লেখা পাঠাতে হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুন্দর হস্তাক্ষর-বিশিষ্ট রচনা সর্বাগ্রে দেখা হয়।

৪. একবার প্রকাশিত (হাতে-লেখা পত্রিকাতে হলেও) রচনা কিশোর ভারতীর জন্য পাঠানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অনুরূপ নিষিদ্ধ কিশোর ভারতীতে পাঠাবার আগে বা পরে একই রচনা অন্যত্র পাঠানো।

৫. একই রচনা একবারের বেশী পাঠানো নিষ্প্রয়োজন।

৬. একসঙ্গে খুব বেশী রচনা পাঠানো বাঞ্ছনীয় নয়।

কমলেন্দু ভট্টাচার্যের গল্প

সোনালী মাটির দুঃখ

দাদী, ও দাদী, তোমার বিয়ার গপ্পটা একবার কও না গো!—হাসিনা বুড়ির কোমর জড়িয়ে ধরে আবদার করতে থাকে নাতি সোনাই।

আ আমার মরণ! সেই কথা আর কত শুনবি রে অভাইগ্যার পুত। দাদীর বিয়ার গপ্প শোনতে শোনতে তোর বিয়ার দিন যে আইয়া গেল রে ডেকরা!—এবার গলার স্বর খাটো করে হাসিনা বুড়ি বলে—তা আমার যখন বিয়া হইছিল তোর দাদাও তখন এই তোর মতই ডাগর ছিল রে ভাই!

কও না, কও না গো একবার সেই গপ্পটা!—আরো গভীর আবদারের সঙ্গে হাসিনাকে জড়িয়ে ধরে সোনাই।

নিজের জীবনের পুরোনো কথা স্মরণ করতে গিয়ে তন্ময় হয়ে যায় হাসিনা বুড়ি।

সন্ধ্যা হয়েছে অনেকক্ষণ। চারদিকে গভীর অন্ধকার নেমেছে। নিস্তব্ধ গ্রাম। শুধু মশার ভন্ ভন্ শব্দ ভেসে আসছে। মিটমিট আলো বুকে জোনাকিরা ঘুরে ফিরছে অন্ধকারের বুকে। দখিনা বাতাস বইছে দীর্ঘশ্বাসের মত। চৈতালী হাওয়া বয়ে আনছে লেবু ফুলের গন্ধ। বাতাস ভরে উঠেছে ছাতিম ফুলের মিষ্টি সুবাসে।

হাসিনা বুড়ির বয়স হয়েছে ষাটের ওপর। একমাত্র বার বছরের নাতি সোনাই ছাড়া সংসারে আর তার কেউ নেই। অথচ একদিন আপনজনে ভরা ছিল তার সংসার। স্বামী, ছেলে ও পুত্রবধুদের নিয়ে ভরা ছিল তার ঘর। আর এখন শিবরাত্রির সলতের মত টিমটিম করছে এই সোনাই।

মাটির প্রদীপে একটু সরষের তেল দিয়ে সন্ধ্যায় ঘরে চিরাগ জ্বালে হাসিনা। ভরা সন্ধ্যা উতরে গেলে ওই আলোতেই দুজনের রাতের খাবার খেয়ে নেয়। বাজারে কেরোসিন তেল দুষ্প্রাপ্য। সরষের তেলও ভীষণ আক্রা। তাই হিসেব করে চলতে হয়।

সন্ধ্যার পরে খেয়ে নিয়ে দাওয়ায় হোগলা বিছিয়ে নাতিকে নিয়ে বসে হাসিনা বুড়ি।

সোনাই হয়ত বসে থাকে। হাসিনা হোগলা বোনে। কখনো আগুনের মালসায় গন্ধক গলিয়ে তা সরু পাটকাঠির মাথায় লাগিয়ে দীপ জ্বালাবার শলাই বানিয়ে রাখে।

যেদিন হাতে কোন কাজ না থাকে, নাতির পাশে শুয়ে-বসে কাটায় হাসিনা। নানা রাজ্যের গল্প বলে। কত

যে রাজা-রাণী, ভূত-পেতনী, বন্যা-খরা-দুর্ভিক্ষ-মহামারীর গল্প বলে তার ইয়ত্তা নেই। দাদীর মুখে গল্প শুনতে শুনতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে সোনাই।

হাসিনার চোখে ঘুম আসে না। মাঝ রাত কেটে গেলেও দু চোখের পাতা এক হতে চায় না। শেষপ্রহরের দিকে যা একটু ঘুম হয়। আবার ভোর চারটে হলেই উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে।

দাদীকে চুপ করে থাকতে দেখে, দুহাত দিয়ে তাকে নাড়া দেয় সোনাই।

কি গো দাদী, গপ্প কইলা না! কও না সেই গপ্পটা। —আরো আবদার-অনুনয়ের সঙ্গে হাসিনাকে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরে সোনাই।

প্রায়ই এমনি হয়। দাদীর বিয়ের গল্প শুনতে চায় সোনাই।

হাসিনা প্রথমে ঠাট্টা করে। শেষে যখন আরো ঘন ঘন আবদার করতে থাকে সোনাই, তখন গম্ভীর হয়ে ওঠে। হয়ত সে তার হারানো অতীতের মাঝে ডুবে যায় ক্ষণকালের জন্য।

সোনাই তখন দাদীর তন্ময়তা ভেঙে আবার আবদার করে, কি গো দাদী, কও না, কও না তোমার বিয়ার গপ্পটা!

উদাস দৃষ্টি মেলে দূরের অন্ধকারাচ্ছন্ন তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকে হাসিনা। তার কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের দিনগুলো একে একে ফুটে উঠতে থাকে স্মৃতিপটে।

শেষে এক সময়ে হাসিনার নির্বাক কণ্ঠস্বর মুখর হয়:

সেই—সেইবার, ওই যে বিরাট ঝড় হইছিল না, সব ভাইঙ্গা চুইরা একাকার কইরা দিয়া গেছিল! কী ভীষণ ঝড়, তোরে আর তা কি কমু রে ভাই! চাল পইড়া ঘরে মরছিল মানুষ, গোয়ালে মরছিল গরু। নাও লইয়া যারা গাঙে গেছিল তারা আর কেয়ই ফিরা আহে নাই। সারা দ্যাশে পইড়া গেছিল মড়ক কান্দন।

আমার তখন দশ এগার বছর বয়স। সেইকালে ঐ বয়সের কোন মাইয়া অবিয়াত থাকত না। আমার বাপ ছিল খুব নামজাদা গুণিন। দ্যাশজোড়া ছিল তার ডাক নাম। আমি ছিলাম বাপের একমাত্র মাইয়া। বাপের আর পোলাই পছন্দ হয় না। জামাই বাছতে বাছতে আমার তখন অত বয়স হইয়া গেছিল। যেই কথা কইছিলাম তোরে, সেই আর কী ঝড়ের কথা? হ্যাযে হইলডা কী শোন্, কপালের ল্যাখন ক্যামনে ঘটে হ্যাখ্।

সগলের ঘরের চাল উইড়া গেছিল, কিন্তু আমার গুনিন বাপের ঘরের কিচ্ছু হয় নাই।

ঝড়ের পরদিন থিকা গাঙের ঘাটে আর যাওনের জো ছিল না। গরু, ছাগল আর মাইনষের মড়া কেবল ঘাটে ভাইস্যা আইথো। এত মড়া জীবনে কেয়ই কোন দিন হ্যাখে নাই রে দাদা।

দিন চাইরেক পরে একদিন গাঙের ঘাটে গেছিলাম। গিয়া শুনি কি, ছ্যামরারা সগলে কেবল কইথেছে, 'মরে নাই, পরাণডা অখনো আছে। শীগগির গুণিনরে ডাক।'

সগলের কথা শুইন্যা আউগ্যাইয়া গিয়া দেখি কি, ভাইস্যা আওয়া একটা পোলারে জল থিকা টাইন্যা উঠাইছে তারা। তখনো সে মরে নাই।

ঘাসের উপুর চিৎ কইরা শোয়াইয়া রাখছিল। কী ফর্সা আর সোন্দরই না ছিল পোলাডা তা আর কওন যায় না। তোরে আর আইজ কি কমু রে দাদা, সত্য কথা কইথেছি, ঘরে ফেরনের সময় সারা পথ না সেই সোন্দর মুখখান্ আমার চোখে কেবলই ভাসছিল।

বাপ গিয়া সব দেইখ্যা ঝাড়ফু করল। ছ্যামরা একটু ভাল হইলে তারে উঠাইয়া নিজের ঘরে লইয়া আইল। সেই থিকা সে বাপের কাছেই রইয়া গেছিল। বাপ বড় ভালবাইস্যা ফ্যালাইছিল তারে।

আর ঘরে ফেরে নাই সে ফিরা যাইবই বা কার কাছে? বাপ বেটা ছাড়া সংসারে আর কেয়ই ছিলনা তাগো। বাপ 'ক্যারাইয়া' নাও বাইথ। পোলাও থাকত লগে। ঝড়ের দিন ক্যারাইয়া লইয়া বাপ বেটায় নাও ভাসাইছিল গাঙে। তারপর ঝড় আইল। নাও ডুবল। বুড়া বাপ আর সেই উথাল গাঙের লগে যোঝতে পারে নাই, ডুইব্যা গেছিল। পোলাডারে খোদা ক্যামনে বাঁচাইছিল তা সেই মাত্র জানে!

বাপের কাছে থাইক্যা শ্যাষে সে ঘরের পোলার মতই প্রায় হইয়া গেছিল। আমার কিন্তু তবু তার ধারে-কাছে গেলে কমন যেন শরম লাগত।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ কণ্ঠস্বর নিচু করে সোনাইর মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে হাসিনা বুড়ি— আইজ তোরে সাচা কই ভাই, তারে না লুকাইয়া লুকাইয়া হ্যাখতে খুব পরানে লইত।

কি গো দাদী!— নিস্তব্ধ অন্ধকারের বুক চিরে খিলখিল করে হেসে ওঠে সোনাই।

হাসিনাও নাতির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে হাসে।

আর দাদা কী করত?— হাসতে হাসতে সোনাই জিজ্ঞাসা করে।

—মরণ আমার কপালে! অত বোঝনের বয়স কি আমার হইছিলনি তখন?

ব্যাগ্র কণ্ঠে সোনাই জিজ্ঞাসা করে— তারপর?

—তারপর আর কি, বাপ একদিন সেই ভাইস্যা আওয়া পোলার লগে বিয়া দিল আমার।

হাসিনা বুড়ির কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে বুজে আসে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে থাকে:

আমার তখন তিন পোলা। তোর বাপ কোলে।

কষ্ট কারে কয়, বাপ বা সোয়ামী কেয়ইর ঘরে আগে কোনদিন বুঝি নাই। সোয়ামী আমার গতর হাঙ্গাইয়া গোলা ভরা ধান আর গোয়াল ভরা গরু করছিল রে ভাই।

খোদা যে কপালে অনেক দুঃখ্যু লেইখ্যা রাখছে তা কিন্তু বুঝি নাই। একবার ছ্যাখা দিল খরা! আসমান থিকা এক ফোঁটাও বিষ্টি পড়ল না সেইবার— দিনভোর কেবল আগুন বিষ্টি হইত আসমান থিকা! সব জইল্যা পুইড়া ছাই হইয়া যাইতে লাগল চাইরদিকে। সারা ছ্যাশে উঠছিল মাইনষের হাহাকার।

এক দানা ধানও ঘরে ওঠল না সেইবার। তোর দাদা নিরুপায় হইয়া শ্যাষে দক্ষিণ ছ্যাশে ধান কাটতে গেছিল। ঐ ছ্যাশে নাকি সেইবার ভালই ফসল হইছিল। আগে ছ্যাখতাম, যাগো জমিজিরাৎ নাই তারা দক্ষিণ ছ্যাশে ধান কাটতে যায়। ঐ ছ্যাশে অনেক ধান হয়। ধান কাটনের কামিনের অভাব, তাই আমাগো ছ্যাশ থিকা মানুষ যাইত খন্দের সময়। ফেরনের কালে নাও ভইরা ধান লইয়া আইথ।

তোর দাদা তো দক্ষিণে গেল। দিন যায়, মাস যায়। আশায় আশায় থাকি আইজ ফিরব, কাইল ফিরব ভাইব্যা। শ্যাষে বছর ঘুইরা আইল। তবুও সে ফিরল না। পথের দিকে চাইয়া চোখের জলে ভাসন ছাড়া আমার আর কিছুই ছিলনা রে দাদা!

কত লোকে কত কথা কইথ। অনেকে কইছে, দক্ষিণ ছ্যাশে গিয়া নতুন ঘর সংসার বাইন্ধ্যা আমাগো ভুইল্লা গ্যাছে। আবার কেয়ই কইথ বাঘে খাইছে তারে। আমার পরাণ পরথম এইসব কিছুই বিশ্বাস করত না। শ্যাষে মনে লইতে লাগল, হয় বাঘেই খাইছে নয়ত বা জলে ভাইস্যা আওহা মানুষ আবার জলেই ভাইস্যা গ্যাছে।

আস্তে আস্তে ভাঙ্গা বুক বান্ধলাম। প্যাটের তিন শত্তুরের কথা তো না ভাইব্যা উপায় ছিল না। ঐ তিন শত্তুর না থাকলে আমিও হয়ত একদিন গাঙে ডুইব্যা পরানের জ্বালা নিভাইতাম।

খোদা যে এত দুঃখ্যু কপালে ল্যাখছিল তা কিন্তু আগে ভাবতেও পারি নাই রে ভাই। সোমত্ত বৌ, তিনডা বাচ্চা পোলা লইয়া একা থাকতে গিয়া কত বিপদে যে পড়ছি তা আর তোরে কি কমু অখন। কিন্তু আমি একটুও ডরাই নাই। মনে ছিল আমার ভীষণ সাহস। পয়সা ছিল না তো যে কামিন রাখুম। বাড়ী ঘিরা যেইটুকু চাষের জমি ছিল তা নিজের হাতে কোদাল দিয়া কোপাইয়া চাষ করছি। বাইরে ও ঘরে মরদ ও মাইয়ালোকের কাম একা করতাম আমি। ছ্যাশ জোড়া নামী গুণিনের আদরের একমাত্র মাইয়ার অমন অবস্থা দেইখ্যা মাইনষের অবাক না হইয়া উপায় ছিল না।

জমিজমা তো খরার বছরেই প্রায় শ্যাষ হইয়া গেছিল। বাকী যেইটুক ছিল তা নিজের হাতে চাষ কইরা মাস ছয় সাতেকের খোরাক পাইতাম। বাকী কয়ডা মাস বড় কষ্টে দিন কাটত রে দাদা। তখন বনের শাক, পাতা, কচু, লতা এই হগল দিয়া কোন রকমে পরান ধইরা রাখতাম। এমন কইরা বছরের পর বছর গ্যাছে। শ্যাষে পোলারা বড় হইয়া ওঠলে দেহের খাটনী থিকা একটু রেহাই পাইছিলাম।

একটা জিনিস কিন্তু আমরা জন্মের পর থিকা দেইখ্যা আইছি রে দাদা,—দুই বছর যেই পর পর ভাল ফসলফলল তার পরের বছরই আবার হয় খরা না হয় বন্যা লাইগ্যা আছেই। মানুষ যেই একটু সুখের মুখ ছ্যাখে, খোদা যেন লগে লগে তারে দুঃখ্যু দিয়া মনে করাইয়া ছান, 'সুখ পাইয়া আমার কথা বড় বেশী ভুইল্লা যাও যে তোমরা, মানুষ!'

ঐ রকম এক অজন্মার দিনে বড় কষ্টের মইধ্য দিয়া আমাগো দিন কাটছিল রে দাদা। সেই সময়ে একদিন প্যাটের বড় শত্তুরে সন্দা বেলা গেছিল মাছ ধরতে। বাইং মাছ ভাইব্যা ভুল কইরা জাইত সাপের গায়ে হাত দিয়া, কামড় খাইয়া সেইখানেই ঢইল্লা পড়ে। লগে যারা ছিল ধরাধরি কইরা বাড়ী লইয়া আহে। বাপের মত সোনার বরণ পোলা আমার তখন নীল হইয়া গ্যাছে! প্যাটে জোটত না ভাত, তবু গতর কী, যেন পাষাণ! হতভাগী আমি কিন্তু ঠিক বাঁইচ্যা রইলাম।

আবার বুক বান্ধলাম। ঘরে তখনো দুই শত্তুর ছিল।

শ্যাষে তোর বাপ আর তার বড়টা যখন সেয়ানা হইল, তখন মনে ভাবছিলাম, হয়ত আমার দুঃখ্যু একটু সারব।

পরপর দুই পোলা বিয়া দিলাম। লক্ষ্মী পরতিমার মত বউ আনছিলাম ঘরে। কিন্তু আল্লা যার কপালে দুঃখ ল্যাখছে, তারে সুখ দিব কে?

মাইঝ্যা পোলাডা বড় হারমাদ ছিল— কোন ভয় ডর ছিলনা তার পরানে। কিন্তু মনডা ছিল খুব সাচ্চা। লোকের লইগ্যা জান-পরানও দিতে পারত।

ঐ পোলাডারে যেইবার বিয়া করাইলাম তার পরের বছর আবার আকাল আইল। মানুষ প্যাটের দায়ে বাড়ী ঘর গরু বাছুর বেইচ্যা খাইল। তাতেও যখন প্যাটের আগুন নেভান আর সম্ভব হইল না তখন গাছপাতা যা পাইল আখাজা-কুখাজা খাইয়া মরল। গেরস্থ ঘরের বউ-ঝিরা আচি হাতে বড়লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুইরা বেড়াইত ভিক্ষার লইগ্যা।

গোঁয়ার পোলাডা চোখের উপুর মাইনষের ঐ অবস্থা দেইখ্যা বড় মনমরা হইয়া গেছিল। নিজের শক্তি মত লোকেরে সাহায্য করত। কিন্তু শুকনা সমুদ্দরে এক ফোঁটা জল ঢ ইল্যা আর কী হয়!

আমাগো অবস্থা সেইবার অনেক ভাল ছিল। দুই পোলায় গতর খাইট্যা আগের খন্দে অনেক ফসল উঠাইছিল। ঐবার ধানও হইছিল প্রচুর। পরের বছর কি হইব না হইব ভাইব্যা আমি এক কণা ধানও বেচি নাই।

মাইঝ্যা পোলার মাথায় শ্যাষে একটা কেরা ঢোকল। আমি ছাই তা জানতেও পারি নাই।

পাড়ার জোয়ান মরদগো ডাইক্যা কইথে আরম্ভ করল, এমনে না খাইয়া মরছ ক্যান? তোগো ঘরের বউ-ঝিরা আইজ আচি হাতে ভিক্ষায় বাইরাইছে ক্যান? গরীব চাষা কইয়া আমাগো কি কোন ইজ্জত নাই নাকি? তার থিকা চল বন্দরে যাই, মহাজনের গুদামে মোনে মোন্মে চাউল জমা আছে, লুইট্যা আইন্যা গরীব লোকের মইধ্যে বিলাইয়া দিমু। মহাজন মাঠে ধান জন্মায় না, জন্মাই আমরা। আমাগো সেই ধান মহাজনের ঘরে থাকব আর আমরা না খাইয়া মরুম, তা হইব ক্যান? চাইলে যখন দিব না, তখন চল গিয়া জোর কইরা আনি। কয়ডা আর পাহারাদার আছে? আমরা যদি সগলে যাই তবে গুলিই বা করব কয়ড? এমনেতেই তো না খাইয়া মরতেছি, না হয় গুলি খাইয়াই মরুম। আমাগো আপনজনেরা তো তবু দুইডা দিন প্যাট ভইরা খাইতে পাইব।

মাইঝ্যা পোলাডার কথা শুইন্যা মুখে তাল দিছে অনেকে। আসলে কাজের বেলায় পিছাই গেছে সগলে। তলে তলে অনেক আবার গোপন কথা ফাঁস কইরা দিছিল। অভাইগ্যা পোলাডা তা কিছুই বোঝতে পারে নাই।

শ্যাষে জনাকয় ছ্যামরারে লগে লইয়া একদিন গুদাম লুট করতে গেল পোলায়। আমি তখনো এই সব কিছুই জানতাম না।

মহাজনের গুদামের কাছে গিয়া আমার পোলাডারে আউগ্যাইয়া দিয়া বাকীরা সইরা আইল।

সম্বাদ পাইয়া আগেই পুলিশ আইয়া ছিল। তারা যখন ধাওয়া দিল, হতভাগা পোলাডা চাইয়া ছ্যাখে, পিছনে কেয়ই নাই। ভয়ডর তো কিছু ছিল না তার বুকে, একবার কোন কাজে পাও দিয়া পিছাইয়া আহনের পোলাই ছিল না সে। বুক ফুলাইয়া ধাইয়া গেছিল। আবডাল থিকা পুলিশের লোক তারে নিশান কইরা গুলি মারছিল। অমন কইরাই নিয়তি টানল তারে!

মাইঝ্যা পোলাডা মরনের পর সারা গ্রামের মানুষ আমারে 'ডাকাইত্যার মা' কইয়া ডাকত। পোড়াকপালী বউডা বাড়ীর বাইরে যাইতে পারত না। তারেও সগলে 'ডাকাইত্যার বউ' কইয়া ডাকত। মনের দুঃখে অভাগী একদিন করবীর গোটা বাটা খাইয়া পরানের সব জ্বালা জুড়াইছিল।

তারপর অনেকদিন গেল। আমার প্যাটের একমাত্র তোর বাপই বাঁইচ্যা। তোর মায়ের কোল খালি। আমার কপালে আর নাতির মুখ ছ্যাখনের ভাইগ্য নাই, এই কথাই ঠাওরাইছিলাম। ভাবছিলাম, আল্লা বুঝি আমারে নিব্বইংশাই কইরা রাখব। শ্যাষে একদিন বেহস্ত থিকা খোদা পাঠাইল আমার সোনাই চান্দরে।

গভীর স্নেহের আদরে বুড়ি শীর্ণ ডান হাতখানা নাতির পিঠে বোলাতে থাকে।

কিন্তু আমার কপালে যে সুখ ল্যাখা নাই, তাই তুই কোলে আহনের পর থিকা তোর মায়ের ধরল কাল রোগে। যা খাইত কিছুই আর প্যাটে সইত না। দিন দিন শুকাইয়া কাঠ হইয়া যাইতেছিল বৌডা। হকিমী,

কবিরাজী, ঝাড়ফুঁ—যা পারলাম করাইলাম, কিন্তু কিছুই হইল না রে দাদা।

আগের বছরে ধান তেমন ভাল হয় নাই। চিরকালের সেই হাহাকারে ভইরা উঠছিল দ্যাশ।

বন্দরের দিকে বড় ডাক্তার ছিল। প্যাটেই ভাত জোটত না, আর বড় ডাক্তার দিয়া চিকিচ্ছা করামু ক্যামতে ক?

এত দুঃখ্যু কষ্টের মধ্যেও বউডার মুখে টু শব্দও ছিল না। আমরা দুঃখ্যু করলে উল্টা শুকনা মুখে হাইস্যা আমাগো পর্‌বোধ দিত।

কাম-কাইজের লইগ্যা তোর বাপ তখন খুব চেষ্টা করছিল। দ্যাশগেরামে কাম কইথে তো একমাত্র বদলার কাম, নয়তো বন্দরে গিয়া মোট টাননের কাম। দ্যাশে যখন দুর্দিন আহে তখন এইসব কামও আর জোটে না।

সারাদিন বাইরে ঘুইরা তোর বাপ যখন কালা মুখ কইরা বাড়ী ফিরা আইয়া মাথা গুঁইজ্যা বইয়া থাকত, তা দ্যাখলে পরান-বাইন্ধা রাখন যাইত না। পোলাডার ঐ অবস্থা দেইখ্যা আমার বড় বুক কাঁপত। ভয় হইত, কি জানি কপালে আরো কত কি ল্যাখা আছে!

তারপর কি হইল শোন্, তোর বাপ একদিন আহ্লাদে আটখান হইয়া বন্দর থিকা আইয়া কইল, 'কাম পাইছি। আইজই বিকালে রওনা দিমু। কাম যে দিতেছে যাতায়াত, খাই-খরচাও তারই।'

কাজ পাইছে ভাল। কিন্তু এত সোজাভাবে কাম জুইট্যা গেল? এমন দয়াবান লোকটাই বা কে আইল? তার লগে ক্যামনেই বা এত জানা-শোনা হইল? নানা কথা ভাবাই মনটা কেমন যেন খুঁত-খুঁত করতে লাগল।

একদিনের পথ সদর।

সেইদিন আর না, পরদিন সকালে রওনা হইয়া গেল তোর বাপ।

পোলা গেল কামে। তখন অনেক কথাই মনে আইথেছিল।

কয়দিন যাইতে না যাইতেই দেখি, সে ফিরা আইল। আর পোলার তখন সে কী অবস্থা! স্টীমার ঘাট থিকা হাইট্যা আহনের শক্তি পইর্যন্ত ছিল না। চেনা লোকেরা দেইখ্যা শ্যাষে ধইরা বাড়ী লইয়া আইছিল।

পোলার অবস্থা দেইখ্যা পরানডারে আর বান্ধথে পারি না। সারা মুখখান তার সাদা ফ্যাকাইস্যা হইয়া গেছে। আমার কপালে যে আবার আগুন লাগছ তা আর তখন বোঝতে বাকী ছিলনা রে দাদা!

সদর থিকা ফিরা আইয়া, দিন পোনার পরানডা ছিল তার। পরথম দিকে কথাবার্তা কইথে পারত। তখন তার মুখেই শুনছিলাম, বন্দরে এক নতুন ভদ্দর লোকের লগে নাকি তোর বাপের আলাপ হইছিল। বড় ভাল ভাল কথা কইথ সে। কথায় কথায় সে গরীব-দুঃখীর লইগ্যা খুব দরদ দ্যাখাইত। অনেক লোকেরে সে নাকি শহরে লইয়া গিয়া চাকরীও দিত। আলাপ-পরিচয় বেশি হইলে, তোর বাপ ও আরো কতগুলান পোলারে চাকরীর লোভ দিয়া শ্যাষে সদরে লইয়া গেছিল।

শহরে গেলে দুইদিন খুব আদর যত্ন করল। মিঠা কথায় সন্দেহবাদী গো মনেও বিশ্বাস জন্মাইল। সগলের মনে হইছিল, অমন দরদী মানুষ বুঝি খোদা আর দুইডা বানায় নাই।

দুইদিন পরে অনেক আশার কথায় ভুলাইয়া, লোকটা ও তার একজন সাগরেদ পোলাগুনার গায়ের থিকা রক্ত উঠাইয়া নিছিল। রক্ত নেওনের কালে লোকটা পেত্যেকেরে কইছিল, জাহাজে ভাল চাকরী পাইবা তোমরা। ঐ কাম হওনের আগে সগ্যালের রক্ত ডাক্তারী পরীক্ষা করতে হইব। তা না করলে তো চাকরী হইব না। লোকটার কথা শুইন্যা কেয়ই আর টু শব্দ করে নাই। তারাও ইচ্ছামতন কাজ হাসিল কইরা, এক-এক জনের হাতে পাঁচ-পাঁচটা টাকা গুঁইজ্যা দিয়া উধাউ হইয়া গেছিল।

ঘরে ফিরা আইয়া সেই যে বিছানা নিল আর দাঁড়াইতে পারল না তোর বাপ।

হয়ত একটু দুধ মাছ খাওয়াইতে পারলে ভাল হইত তা আর আমি পারি নাই রে দাদা। শ্যাষে একদিন বিয়ান বেলা গিয়া দ্যাখি, পরানের ধন আমার কাঠ হইয়া আছে!

হাসিনা বুড়ি গল্প বলতে বলতে সব ভুলে যায়, তার আর কিছু খেয়াল থাকে না। কারণ একথা যে তার জীবনের কথা— হাসি-কান্নার বেদনাঘন করুণ ইতিকথা। একথার কোন শেষ নেই হাসিনার কাছে।

এতক্ষণ খেয়ালই করেনি হাসিনা বুড়ি, দাদীর বিয়ের গল্প শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সোনাই।

ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল হতেই হারানো অতীতের স্মৃতিলোক থেকে সে ফিরে আসে অন্ধকারে ঢাকা তার ছোট্ট ভাঙা ঘরের দাওয়ার বাস্তবতার মাঝে।

দাদীর হাঁটুর ওপর মাথা রেখে ঘুমোনো সোনাইর সারা গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলতে থাকে— আরে আমার অভাইগ্যার ব্যাটা যে ঘুমাইয়া পড়ছে। তা

(শেষাংশ ২৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সঙ্কর্ষণ রায়

শিমলিপালের বনে বুনো মোষের দেখা পেয়ে বন্য গরু সম্বন্ধে আমার আগ্রহ হল। মোষের মত গরুরও বন্য সংস্করণ আছে নিশ্চয়ই। কারণ গরু চিরকাল মানুষের গৃহপালিত এমন হতে পারে না। বুনো গরুকে বন থেকে ধরে এনেই নিশ্চয়ই পোষ মানানো হয়েছে।

খোঁজ নিতে গিয়ে জানলাম যে বুনো গরু খুবই দুর্লভ প্রাণী। বছর পঁচিশেক আগে পর্যন্ত এ দেশের সব বনেই তারা ঘুরে বেড়াত। কিন্তু এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে।

এ দেশে শুধু নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই তারা লোপ পেতে বসেছে। অবশ্যম্ভাবী বিলোপের আশঙ্কায় উত্তর আমেরিকায় তাদের কয়েকটিকে চিড়িয়াখানায় ধরে রেখে লালন-পালন করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

তেমন কোন চেষ্টা এদেশে হয়েছে বলে জানি না। গৃহপালিত গরুদের নিয়েই আমরা এতই বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত যে, বুনো গরুদের নিয়ে মাথা ঘামাই নে। এদেশের বন বিভাগ এদের রক্ষণাবেক্ষণে তেমন উৎসাহিত নয়। বাঘ, চিতাবাঘ বা হাতিকে বাঁচাবার জন্য যে তৎপরতা দেখা যায়, তার সিকিভাগ চেষ্টাও দেখা যায় না এদের সংরক্ষণের ব্যাপারে।

তবে কোথাও কোথাও এদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছু কিছু চেষ্টা দেখা যায়। নেফাতে এদের ধরে পোষ মানানো হয়েছে। পোষ মানা এই বুনো গরুকে বলে 'মিথুন'। দক্ষিণ বর্মা ও মালয়েও বুনো গরুকে ধরে লালন-পালন করা হয়েছে। ওখানে পোষা বুনো গরুকে বলে 'সেলডাং'।

ধরে পোষ না মানিয়ে, বুনো গরুকে বনের মধ্যে সংরক্ষণের একটা খবর পেয়েছিলাম মহীশূরের একটি বন থেকে। বনটা সংরক্ষিত বনের এলাকার মধ্যে অবস্থিত হলেও স্থানীয় 'কুরুবা'দের তৎপরতাতেই বুনো গরুরা ওখানে সংরক্ষিত হয়েছে। নইলে বন বিভাগের সাধ্য ছিল না ওদের বাঁচিয়ে রাখার। কারণ বুনো গরু দুর্লভ বলে বিহারীরা তাদের শিকার করে আনন্দ পায়। বাগে পাওয়া বাঘকে ছেড়ে দিয়েও কোন কোন শিকারী বুনো গরুর পেছনে ধাওয়া করে। এদের কবলে পড়েই মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, উত্তরবঙ্গ ও আসামের বন থেকে বুনো গরুরা নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে।

কুরুবারা কী ভাবে বুনো গরুদের আগলে রাখে তার রিপোর্ট পেয়েছিলাম আমি আমার বন্ধু দেবব্রত ঘোষের কাছ থেকে। সে তখন মহীশূরের বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ভূতাত্ত্বিক পরিক্রমার সূত্রে।

দক্ষিণ মহীশূরের পাহাড়ে জঙ্গলে নানা ধরনের মূল্যবান

খনিজের ভাণ্ডার রয়েছে। সেগুলোর হদিস নিতে নিতে দেবব্রত এসে পৌছল বান্দিপুরের বনে। এখানে বন খুব গভীর এবং বনের একটা বড় অংশ 'গেম্‌স্ স্যাংচুয়ারি' অর্থাৎ অভয়-অরণ্যের এলাকার মধ্যে পড়ে'ছ। এখানে ঘোরাঘুরি করার জন্য বন বিভাগ থেকে 'গাইড' বা পথ-প্রদর্শক নেবে কিনা ভাবছে দেবব্রত, এমন সময় তার সঙ্গে আলাপ হল আর. সি. মরিস নামে একজন বন্য প্রাণি-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে। এককালে খুব নামকরা শিকারী ছিলেন মরিস। কিন্তু শিকার করতে করতেই বন্য প্রাণীদের প্রতি মমতা বোধ করতে শুরু করেন এবং তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকারী বন বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সুরু করেন। বান্দিপুরের বনেই তিনি বাস করেন। বনের প্রাণীদের কাছাকাছি থেকে তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হন। সরকারী বন বিভাগ ওখানে অভয়-অরণ্য গড়ে তুলেছে, কিন্তু বনের প্রাণীরা তাঁকেই তাদের অভয়দাতা বলে মনে করে। মরিস বনের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে শুরু করলে তারা তাদের বনের গোপন আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসে। তার কাছাকাছি ও পাশাপাশি তারা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়, কারণ তারা জানে যে, মরিস কাছে থাকলে শিকারীরা তাদের কাছে ঘেঁষতে সাহস পাবে না।

দেবব্রতর সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগে মরিস ভেবেছিলেন, বুঝি সে শিকারের মতলবে এসেছে। কিন্তু আলাপ হতেই তাঁর ভ্রান্তি দূর হল এবং তিনি নিজেই বনের মধ্যে তার পথপ্রদর্শক হতে চাইলেন।

বান্দিপুরের বনের মধ্যে মরিসের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে করতে হাতি, বুনো শুয়োর, চিতাবাঘ, ভালুক এমনকি বাঘ ও বুনো মোষের দেখা পেল দেবব্রত। দেখে খুশী হয়ে সে বললে, বনে যারা থাকে তারা সকলেই দেখছি নির্ভয়ে আপনার কাছে চলে আসছে। ওদের পোষ মানালেন কী করে?

মৃদু হেসে মরিস বললেন, পোষ ঠিক মানাই নি, ওদের মন থেকে শুধু মানুষ সম্বন্ধে ভয় দূর করেছি। জানেন নিশ্চয়ই যে, এ বনে শিকারের মতলবে কেউ আসতে পারে না।

—তা তো পারবেই না। গেম্‌স্ স্যাংচুয়ারিতে শিকার পুরোপুরি নিষিদ্ধ নয় কি?

—যাদের শিকারের নেশা আছে, তারা কি আর নিষেধ মানতে চায়! বরঞ্চ নিষিদ্ধ এলাকাতেই তাদের শিকারের ঝোঁক বাড়ে। নিষেধের জন্য নয়, আমার ভয়ে এদিকে কোন শিকারীই ঘেঁষতে সাহস পায় না। কারণ শিকারীরা জানে যে, এখানে কেউ শিকারের চেষ্টা করলে আমি তাকে শিকার করে বসব।

—তার মানে বন বিভাগের হয়ে আপনিই বন্য প্রাণীদের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন?

—বন বিভাগের হয়ে নয়, আমার নিজের গরজেই আমি ওদের রক্ষণাবেক্ষণ করছি, কারণ ওদের আমি ভালবাসি। তবে বনবিভাগ তেমন তৎপর হলে আমাকে এমনি দিবারাত্রি বনের মধ্যে পাহারা দিতে হত না।

বান্দিপুরের বনের প্রায় সর্বত্র দেবব্রতকে নিয়ে যান মরিস। তাঁর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে করতে তার মনে হল বনের প্রতিটি গাছপালাকে তিনি চেনেন, প্রতি ইঞ্চি জমি তাঁর মুখস্থ।

দেবব্রতকে সব জায়গায় নিয়ে গেলেও মরিস একটি পাহাড়কে এড়িয়ে যান। বান্দিপুরের বন একটি উঁচু মালভূমির ওপরে অবস্থিত। সেই পাহাড়টি মালভূমির ওপরে যেন উটের পিঠের কুঁজের মত বসানো আছে। সেই পাহাড়ের তলায় দেবব্রতকে নিয়ে গেলেও পাহাড়ের ওপরে ওঠেন না মরিস। দেবব্রত মনে করে, বুঝি মরিসের হৃৎপিণ্ডঘটিত কোন ত্রুটি আছে, হয়তো এমন কোন হৃদ্‌রোগে ভুগছেন তিনি যার দরুন পাহাড়ে চড়তে তিনি পারেন না। এ ব্যাপারে অবশ্য মরিসকে কোন প্রশ্ন করে না সে। তার মনে হয় এ ধরনের প্রশ্ন করে মরিসের মত দুর্ধর্ষ শিকারীকে শুধু বিব্রত করা হবে।

দেবব্রত মুখ ফুটে কিছু না বললেও তার মুখের ভাবে তার মনোভাব আন্দাজ করতে পারেন মরিস মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে তিনি বলেন, আমি এই পাহাড়ে চড়ছি না কেন তা নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে তোমার? মুখ ফুটে যদিও কোন প্রশ্ন করছ না।

বুঝতে পারছি আপনার শারীরিক কোন অসুবিধে আছে।—মুখ নীচু করে দেবব্রত বললে, হয়তো কোন হার্ট ট্রাব্‌ল্—

—হার্ট ট্রাব্‌ল্ বা কোন শারীরিক অসুবিধে আমার

নেই। বাধা না থাকলে দেখতে কী রকম দ্রুতগতিতে আমি পাহাড়ে চড়ছি।

—ঐ পাহাড়ে চড়তে কিসের বাধা মিস্টার মরিস?

—ঐ পাহাড়ের ওপরে বুনো বাইসনরা থাকে, তাই।

—বুনো বাইসন খুব হিংস্র জানোয়ার বুঝি?

—না। আত্মরক্ষার জন্য মাঝে মাঝে হিংস্র হয়ে উঠলেও মোটামুটি নিরীহ জানোয়ার। ওদের ওপরে কোন রকম উপদ্রব না করলে ওরা কিছু বলে না।

—তাহলে পাহাড়ে চড়তে বাধাটা কোথায়?

—পাহাড়ের নীচে ঐ যে গ্রামটা দেখছ, ওখানে 'কুরুবা' নামে উপজাতির মানুষরা বাস করে। পাহাড়ের ওপরে বসবাসকারী বুনো বাইসনদের ওরা আগলে রেখেছে। ওরা চায় না যে, আমরা বাইসনদের কাছে যাই।

আপনাকেও ওদের কাছে ঘেঁষতে দিতে চায় না!—দেবব্রত অবাক হয়ে বললে, এ বনের বুনো জন্তুজানোয়ারদের যে আপনি আগলে রেখেছেন তা কি ওরা জানে না?

জানে বই কি!—মরিস জবাব দিলেন, কিন্তু ওদের ধারণা, আর সব জানোয়ারদের বাঁচিয়ে রাখতে চাইলেও সুযোগ পেলেই আমি বাইসনদের মেরে ফেলব।

—ওদের এই ধারণার হেতু?

—ওদের এই ধারণার হেতু কী তা আমি এক কথায় বুঝিয়ে বলতে পারব না। তোমার যদি ধৈর্য থাকে, আগাগোড়া সব কিছু খুলে বলতে পারি।

—বলুন না মিস্টার মরিস। আমার মত ধৈর্যবান শ্রোতা আপনি ভূভারতেও কোথাও খুঁজে পাবেন না।

মরিস তাঁর কাহিনী শুরু করার আগে বুনো বাইসন সম্বন্ধে দু-একটি কথা বললেন। বাইসনকে ঠিক বন্য গরু বলা চলে না। বুনো গরু ও মহিষের মাঝামাঝি এক ধরনের জানোয়ার, দেখে কখনো গরু, কখনো বা মহিষ বলে মনে হতে পারে। এদেশে যাকে আমরা বাইসন বলি, তাকে কিন্তু বাইসন বলা উচিত নয়। তা গরুরই বন্য সংস্করণ—মোষের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। 'বাইসন' না বলে তাকে 'গাওর (Gaur)' বলাই উচিত।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 'গাওর'কে 'বাইসন' বলে ভুল করা হয় কেন? ব্যাপারটা নিয়ে দাক্ষিণাত্যে ও মধ্যভারতের বনে বনে সন্ধান নিয়েছিলেন বিখ্যাত বন্য প্রাণিসংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ ই. পি. জি.। খোঁজখবর নিতে নিতে হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, যে, বনের মানুষরা 'গাওরকে' 'ভঁইসা' বলে থাকে হয়তো তাকে তারা বুনো মোষ বলেই জানে। 'ভঁইসা'কে কোন কোন শিকারীর 'বাইসন' বলে ভুল হওয়া অসম্ভব নয় হয়তো বনের মানুষদের মুখে 'ভঁইসা' শুনে 'গাওর'কে 'বাইসন' বলা হচ্ছে। মরিসও তাকে বাইসনই বলেন।

'বাইসন' বললেও তা যে "গাওর' তা তাকে দেখেই বোঝা যায়। তবে তার গায়ের রঙ বুনো কালো। কালো হলেও কালো রঙের মধ্যে একটা জৌ স আছে যা মোষের গায়ের চামড়ায় দেখা যায় না। বলিষ্ঠ দেহ, উচ্চতায় পাঁচ থেকে ছয় ফুট, ওজন নশো কেজিরও বেশি, মাঝে মাঝে এক টন ওজনের বড়ো আকারের বাইসনও দেখা যায়। তার বিপুল মাংসবহুল শরীরের অনুপাতে পা চারটিকে রীতিমত খাটো বলে মনে হয়। কাঁধ বেশ চওড়া, গলার নীচে সুন্দর গল-কম্বল। তার চলার সঙ্গে তাল রেখে গল-কম্বল দুলতে থাকে। মাথায় খাটো, বাঁকানো ঈষৎ সবুজ রঙের শিঙ। মাথার চাঁদির ওপরটা কিছুটা উঁচু, দুদিকে নীচু হয়ে শিংয়ের গোড়ায় গিয়ে মিশেছে। কপালটি ফ্যাকাশে সাদা, পায়ের নীচের দিক ফ্যাকাশে বাদামী রঙের, যেন মোজা পড়েছে।

বাইসন পাহাড়ের ওপরে থাকতে ভালবাসে। গভীর বনে ঢাকা পাহাড়ের ওপরে তারা বাস করে। বান্দিপুরের পর্বতচূড়ার কাছে চার হাজার ফুটেরও ওপরে তাদের বাস। স্ত্রী বাইসনরা সন্তানবৎসল, স্বভাবে হিংস্র নয়। তবে সন্তানদের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটলে তারা তেড়ে আসে। হিংস্রতা পুরুষ বাইসনদেরও স্বভাবগত নয়, কিন্তু দলের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে তারা প্রায়ই আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয়। কাজেই পুরুষ বাইসনদের সম্বন্ধে খুব সতর্ক হওয়া দরকার। একদা জলপাইগুড়ির একটি বনে একটি ক্ষেপে যাওয়া বাইসন একজন বনরক্ষককে শিঙ দিয়ে গুঁতিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল এবং শিঙ দিয়ে তার দেহটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে তাকে মেরে ফেলেছিল।

বুনো হাতি ও মোষদের মত বাইসনরা জলার ধারে ঘাসবনের মধ্যে চরে বেড়ায়। ঘাস খেয়ে পেট ভরিয়ে জলার জলে তেষ্টা মেটায়। তারপর বনের গভীর অংশে

ঢুকে ছায়াঘেরা ঠাণ্ডা জায়গায় বিশ্রাম করে। বনের মধ্যে যেখানকার মাটি লবণাক্ত, সেখানে থাকতেই এরা ভালবাসে। মাঝে নোনা মাটি চাটে। নুনমেশানো মাটি খেলে নাকি এদের পেটের কৃমি মরে যায়।

বুনো হাতি বা মোষদের মত বাইসনরাও দল বেঁধে থাকে। তবে একই দলের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ বাইসনরা দুটি পৃথক্ উপদলে বিভক্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। বছরের মধ্যে বিশেষ একটা সময়ে (সাধারণত শীতকালে) তারা একত্র হয়। তখন পুরুষ বাইসনদের মধ্যে দলের নেতৃত্বের জন্য লড়াই বেধে যায়। যে জেতে সে চায় যে, হেরে-যাওয়া বাইসনরা তার বশ্যতা স্বীকার করে নিক। যারা তার বশ মানে না, তারা দল ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। বলা বাহুল্য, স্ত্রী বাইসনরা এই লড়াইয়ে কোন অংশ নেয় না, জিতে-যাওয়া পুরুষ বাইসনের নেতৃত্ব তারা নিঃশব্দে মেনে নেয়।

পুরুষ বাইসনের এই একনায়কত্বের নেশা কেটে যায় মাস দুয়েকের মধ্যে। তারপর সে দলছুট বাইসনদের খোঁজ নেয় এবং তাদের ডেকে নিয়ে এসে আবার ছত্রভঙ্গ পুরুষ-বাইসনদের সেই উপদলকে গড়ে তোলে নতুন করে।

বাইসনদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য মরিস চেয়েছিলেন বাইসনদের কাছাকাছি থাকতে। তাই বান্দিপুরে গিয়েই বন বিভাগের অধিকর্তাকে অনুরোধ করেছিলেন বাইসনদের আস্তানাটি তাঁকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য।

মরিসের অনুরোধ শুনে কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করেন বন বিভাগের অধিকর্তা। একটু ইতস্তত করে তিনি মরিসকে বললেন, বাইসনেরা যে কোথায় আছে তা আমি ঠিক জানি না মিস্টার মরিস।

বলেন কী! —মরিসের চোখ দুটি কপালে উঠবার উপক্রম হল— আপনাদের সংরক্ষিত বনের এলাকার মধ্যে বাইসনেরা বাস করে, অথচ আপনারাই জানেন ওরা কোথায় থাকে!

—না মিস্টার মরিস। সংরক্ষিত বনের এলাকার মধ্যে থাকলেও ওদের গোপন আস্তানার খবর কুরুবারাই রাখে। ওদের দেখতে হলে কুরুবাদের সর্দারদের শরণাপন্ন হতে হবে। সে হুকুম দিলে তবেই কুরুবাদের মধ্যে একজন আপনাকে পাহাড়ের ওপরে বাইসনদের আস্তানায় নিয়ে যাবে।

—বাইসনদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনারা বুঝি কুরুবাদের দিয়েছেন?

—না, ওরা নিজেরাই বাইসনদের আগলে রেখেছে কারণ শিকারীরা আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে বাইসন মেরে মেরে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল। ওরা যখন বুঝল যে, বাইসনদের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা বন বিভাগের নেই, তখন ওরা বাইসনদের তাড়া করে বনের মধ্যে খুব দুর্গম একটি গোপন জায়গায় নিয়ে গিয়ে রেখেছে। ওখানে একটি ছোটখাটো হ্রদ আছে, ঘাসে-ছাওয়া মাঠেরও অভাব নেই। কাজেই বাইসনরা ওখানে বসবাস করতে আপত্তি করে নি।

—বাইসনদের মত আর সব জানোয়ারদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যও নিশ্চয়ই ওরা খুব তৎপর?

—না, ঠিক তা নয়। আর সব জানোয়ারদের নিয়ে ওরা তেমন মাথা ঘামায় না।

কেন বলুন তো?—মরিস অবাক হয়ে তাকালেন বন বিভাগের অধিকর্তার মুখের দিকে।

কারণ বাইসনকে ওরা দেবতা জ্ঞানে পূজা করে থাকে। —বনবিভাগের অধিকর্তা জবাব দিলেন—কুরুবাদের গ্রামে গেলে ওদের দেবতার স্থানে বাইসনদের মূর্তি দেখতে পাব।

—বাইসনদের মূর্তি নয়, বাইসন দেখতে চাই আমি। আপনি কুরুবাদের সর্দারকে ডেকে বলে দিন না।

—সর্দার আমার কথা শুনবে না। আপনি ওদের গ্রামে গিয়ে সর্দারের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রমাণ দিন যে, আপনি শুধু দেখার জন্য বাইসন দেখতে চান, শিকারের কোন মতলব নেই আপনার। তখন সে আপনাকে বাইসনদের এলাকায় নিয়ে যাবার জন্য গাইড ঠিক করে দেবে।

মরিস তৎক্ষণাৎ গেলেন কুরুবাদের গ্রামে। সেখানে পৌঁছে সর্দারের খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলেন যে, সে তার বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে না, কারণ তার ছেলে খুবই অসুস্থ।

সঙ্গে সঙ্গে সর্দারের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন মরিস এবং নিজেকে চিকিৎসক বলে পরিচয় দিলেন। পেশায় চিকিৎসক না হলেও চিকিৎসা বিজ্ঞানে মরিসের কিঞ্চিৎ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। সর্দারের ছেলেকে পরীক্ষা করেই তিনি বুঝলেন যে, সে টাইফয়েডে ভুগছে। তাঁর ওষুধের বাক্সে অন্যান্য ওষুধপত্রের সঙ্গে টাইফয়েডের ওষুধ,

ভিটামিনের বড়ি ইত্যাদি ছিল। সেই ওষুধ ও ভিটামিন ছেলেটির পেটে পড়তে তার জ্বর নামতে থাকে। দিন দুয়েকের মধ্যেই ছেলেটির জ্বর সম্পূর্ণ ছেড়ে যায় এবং কুরুবারা মরিসকে সাক্ষাৎ রোগহর দেবতা বলে মনে করে। ফলমূল ও মুর্গী উপহার দিয়েই তাদের তৃপ্তি হয় না, তারা তাঁকে আরও কিছু দিতে চায়।

আমাদের কাছ থেকে আরও কিছু নিন আপনি!— সর্দার কৃতজ্ঞতায় গাঢ় স্বরে বললে, বলুন আর কী পেলে আপনি খুশী হবেন।

মরিস বললেন, আর কিছুই চাই নে আমি, শুধু বাইসনরা যে বনে আছে, সেখানে যেতে চাই।

নিমেষে কঠোর হয়ে উঠল সর্দারের মুখ। গম্ভীর গলায় সে বললে, বাইসন শিকারের মতলব আছে বুঝি আপনার?

—না, শিকারের কোন মতলব নিয়ে আমি বান্দিপুরে আসিনি। আমি এসেছি ছবি তুলতে। বাইসনদের ছবি তুলতে চাই আমি।

কয়েক মুহূর্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মরিসের মুখের পানে তাকিয়ে থেকে সর্দার বললে, ছবি তোলার নাম করে শিকার করবেন না তো?

মরিস মৃদু হেসে বললেন, না, তেমন কোন কুমতলব আমার নেই। আমার সঙ্গে ডাকবাংলোতে যদি আস, তোমাকে দেখিয়ে দিতে পারি যে, আমার কাছে ক্যামেরা ও তাঁর সাজসরঞ্জাম ছাড়া আর কিছু নেই।

—ঠিক আছে। চলুন, আমি নিজের চোখে যাচাই করে দেখব।

দেখল সর্দার। কিন্তু তবু তার সন্দেহ ঘুচল না। কারণ ক্যামেরা ও তার আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জামগুলো যে আগ্নেয়াস্ত্র নয় মরিস তাকে তা বোঝাবার চেষ্টা করলেও সে তা বুঝতে পারে না। ক্যামেরার টেলি-লেন্স্ ও তেপায়াকে সে বিশেষ ধরনের মেশিনগান ও রাইফেল বলে মনে করে। মরিস শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে উঠে তেপায়ার ওপরে তাঁর সিনে-ক্যামেরা বসিয়ে সর্দারের ছবি তুলতে উদ্যত হন। তাতে বিষম ভয় পেয়ে সর্দার বললে, ওটা চালাবেন না স্যার—আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি!

মরিস বললেন, সোজা বাইসনদের বনে নিয়ে চল।

দুর্গম চড়াই বেয়ে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে পৌছতে রাত হয়ে গেল। রাতের অন্ধকারে ঘোরাঘুরি করে অন্ত জানোয়ারদের মুখোমুখি হলেও বাইসনের দেখা মিলবে না, কাজেই রাতের মত সর্দারকে নিয়ে একটি কাশের খুপরির মধ্যে আশ্রয় নিলেন মরিস।

পরদিন সকালে সর্দার মরিসকে নিয়ে বনের সবচেয়ে গভীর ও দুর্গম অংশে প্রবেশ করল। এখানে বড় বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে আছে ছোট ছোট লতাগাছের ঝোপ ও ঘাসবন। হরিণের পায়ে-চলা পথও নেই, কাজেই টাঙ্গি নিয়ে ডালপালা কেটে পথ করে এগিয়ে যেতে হয়।

এমনি পথের চিহ্নহীন গভীর বনের মধ্যে বাইসনদের আস্তানাটি সর্দার কী করে খুঁজে পাবে ভেবে পান না মরিস। তাকে প্রশ্ন করেও তিনি কোন জবাব পান না।

চলতে চলতে জায়গায় জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে সর্দার লতা-পাতা ও ঘাসের চাপড়া পরীক্ষা করে। পাথুরে জমির মধ্যে পায়ের ছাপ ফুটে ওঠা সম্ভব নয়, কাজেই ঘাসের মধ্য দিয়ে মাটিতে কিসের চিহ্ন সে খুঁজছে তা বুঝতে পারেন না মরিস। মাঝে মাঝে সে লতাঝোপের পাতায় জমে থাকা শিশিরবিন্দুগুলিকে পরীক্ষা করে। তাছাড়া লতাগাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায় জড়িয়ে থাকা মাকড়সার জালগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। এইসবের মধ্যে বাইসনদের গতিবিধির হদিস কী করে প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে ভেবে পান না মরিস। কিন্তু প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই, কারণ সর্দার কোন কথাই বলছে না।

চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল সর্দার এবং মুখ তুলে বাতাসে গন্ধ শুঁকতে লাগল। কিসের গন্ধ সে শুঁকছে কে জানে, কারণ বাতাসে বুনো লতাপাতা ও ফুলের গন্ধের মধ্যে কোন ব্যতিক্রমই পাচ্ছেন না মরিস। সহসা হাত তুলে মরিসকে ওখানেই অপেক্ষা করতে ইঙ্গিত করল সর্দার।

একটানা প্রায় এক ঘণ্টা ধরে প্রতীক্ষার পর হঠাৎ সামনের ঘাসবনের মধ্যে স্পন্দন জাগে। তারপর প্রায় এক হাজার ফুট দূরে ঘনসন্নিবিষ্ট সেগুন গাছগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে বারো-চোদ্দটা বাইসন। চরতে চরতে ঘাস খেতে খেতে ধীরসুস্থে এগিয়ে আসে তারা। মরিস বা সর্দারকে বোধ হয় তারা দেখতে পায় নি, কিংবা দেখেও দেখে না।

খানিকক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে এদের দিকে চেয়ে থাকেন মরিস। সকালের রোদে ঝলমল করে এদের গায়ের চকচকে কালো চামড়া।

খাপ থেকে ক্যামেরা বের করেন মরিস। স্টিল ক্যামেরা ও সিনে ক্যামেরা। দুটো ক্যামেরাতেই টেলি-লেন্স্ বসিয়ে নেন। তারপর উদ্যত হন ছবি তুলতে।

এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে মরিসের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল সর্দার। চোখের ওপরে ক্যামেরাটা মরিস তুলে ধরতেই সে বিকট চিৎকার করে ওঠে

চিৎকার করছ কেন?—চাপা ধমক দিয়ে উঠলেন মরিস —তোমার চিৎকার শুনে বাইসনগুলো যে তেড়ে আসবে।

তাই তো চাই আমি,—চাপা গম্ভীর গলায় বললে সর্দার —আপনি ওদের মারবেন, আর ওরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে করবে না, সে কী হয়?

But I am shooting with my camera, not with gun—ইংরাজীতে বলে উঠলেন মরিস।

বলা বাহুল্য, মরিসের কথার মর্ম বুঝতে পারে না সর্দার এবং সে চীৎকার করে যেতে থাকে।

সর্দারের চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে বাইসনদের দল থেকে একজন বেরিয়ে আসে। তারপর মাটিতে তার সম্মুখের দু পায়ের খুর ঘষতে থাকে সে।

বিপুল আকারের বাইসনটি আয়তনে সাধারণ ষাঁড়ের চেয়ে অনেক বড়। তার দাঁড়াবার দৃপ্ত ভঙ্গী, উজ্জ্বল জ্বলন্ত দুটি চোখ রীতিমত মোহিত করে মরিসকে। বাইসনটি যে তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে তা যেন তিনি ভুলেই যান। ক্যামেরা তুলে তিনি ছবি তুলে যান। প্রথমে স্টিল ক্যামেরা দিয়ে স্থির চিত্র, তারপর সিনে ক্যামেরা দিয়ে ক্ষিপ্ত ষাঁড়টির তেড়ে আসার চলচ্চিত্র—ক্ষিপ্র গতিতে ক্যামেরা চালিয়ে যান মরিস···

সর্দার এবারে বুঝতে পারে যে, ক্যামেরা ছবি তোলার যন্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র নয়। কিন্তু বাইসনটি তখন ক্ষেপে গিয়ে শিং উচিয়ে তেড়ে আসছে মরিসকে লক্ষ্য করে, আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁকে সে তার শিঙের ঘায়ে মাটিতে ধরাশায়ী করবে।

ছেলের প্রাণদাতাকে এমনি বেঘোরে মরতে দিতে পারে না সর্দার। সে নিজে বাইসনটিকে ক্ষেপিয়েছে, অতএব তারই কর্তব্য তাকে সামলানো। কিন্তু সে নিরস্ত্র, ক্ষিপ্ত বাইসনকে নিরস্ত করা যে বিনা অস্ত্রে সম্ভব নয় তা সে বোঝে। কী করবে ভেবে না পেয়ে সে অস্থির হয়ে ওঠে।

মরিস তখন নিজের জীবনের পরোয়া না করে ক্যামেরা চালিয়ে যাচ্ছেন, আসন্ন বিপর্যয়ের সঙ্কট তাঁকে এতটুকু শঙ্কিত করছে না। সর্দার চিৎকার করে পালিয়ে যেতে বলে তাঁকে, কিন্তু তার কথায় তিনি কর্ণপাতও করেন না।

সর্দার বুঝতে পারে যে, মরিস নিজেকে বাঁচাবার কোন চেষ্টাই করবেন না। অতএব তাকেই চেষ্টা করতে হবে তাঁকে বাঁচাতে।

বাইসনটা তখন খুব কাছে এসে গিয়েছে। আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড।

বিনা অস্ত্রে ক্ষিপ্ত বাইসনের সঙ্গে লড়াই করা যায় না. অতএব মরিসকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় নিজের প্রাণ দেওয়া। তাই দিতে যায় সর্দার—চোখের নিমেষে সে মরিসকে আড়াল করে দাঁড়ায় বাইসনের মুখোমুখি।

ও কী করছ সর্দার!—আর্তস্বরে বলে ওঠেন মরিস এবং ক্যামেরা ছেড়ে দিয়ে পকেট থেকে ক্ষিপ্র গতিতে তাঁর পিস্তল বের করে আনেন। পরমুহূর্তে পরপর দুটি গুলি করেন মরিস বাইসনের শিঙ দুটোর মাঝখানে।

পাকা শিকারী মরিস, অব্যর্থ তাঁর লক্ষ্য—নিমেষে ধরাশায়ী হলো বাইসনটি। মরিসের পিস্তলের গুলি তার মস্তিষ্ক ভেদ করেছে, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সে প্রাণ হারাল।

নিষ্প্রাণ বাইসনের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে সর্দার গম্ভীর গলায় বললে, এ কী করলেন আপনি স্যার!

মরিস বললেন; তোমাকে বাঁচাবার জন্যই মারতে হল ওকে, নইলে কি আর—

আপনার নিজের জান বাঁচাবার জন্য কি ওকে মারতেন না স্যার? —সর্দার মরিসের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললে।

কাষ্ঠহাসি হেসে মরিস বললেন, না মারলে কি আর পারতাম নিজেকে বাঁচাতে! বাধ্য হয়েই মারতে হত। কিন্তু ভেবে দেখ সর্দার, তুমি ওকে ক্ষেপিয়ে তুললে বলেই

ওকে মারার দরকার হল। নইলে ও বেঁচে থাকত। বাইসনদের ছবি তোলা ছাড়া অন্য কোন মতলব নিয়ে তো আসি নি আমি এখানে।

সর্দার গম্ভীর মুখে বললে, নিজেকে বাঁচাবার জন্য আপনি যাই করুন না কেন, আমাকে বাঁচাবার জন্য ওকে মারা উচিত হয় নি আপনার।

—কিন্তু ও যে তোমাকে মেরে ফেলত!

—তা না হয় ফেলত, কিন্তু তাতে তেমন কিছু ক্ষতি হত না। আমার চেয়ে ওর প্রাণের দাম অনেক বেশী।

এর পর আর কোন কথা বলেন নি মরিস। সর্দারের মুখেও আর কোন কথা জোগায় না—তার মুখের ভাবে অবশ্য বোঝা যায় যে, সে বেশ মর্মাহত।

মরিস তাঁর কাহিনী শেষ করে বললেন, বুঝতে পারছ তো মিস্টার ঘোষ, আমি যে বাইসনদের বাঁচিয়ে রাখতে চাই তার প্রমাণ দিতে গিয়েও পারি নি দিতে, কারণ ক্যামেরা দিয়ে শুটিং করতে গিয়ে পিস্তল দিয়ে শুট করতে বাধ্য হয়েছিলাম। কাজেই বাইসনদের বনের ঠিকানা জানলেও ওখানে যাবার বা কাউকে নিয়ে যাবার উপায় নেই আমার।

সোনালী মাটির দুঃখ [২৪২ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ঘুমা—ঘুমা। ষাইট, ষাইট! সোনা আমার। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়া আমার মাথায় যত চুল আছে তত বছর জিও! লক্ষেশ্বর হইও!

কিছুক্ষণ পরে সোনাইর মাথা হাঁটু থেকে নামিয়ে আস্তে আস্তে কুঁজো হয়ে এগিয়ে গিয়ে দাওয়ার ঝাপ-খান বন্ধ করে দেয় হাসিনা বুড়ি। তারপর নাতির কাছে ফিরে এসে নিজেও একটু কাত হয় গড়িয়ে নেবার জন্য।

হঠাৎ গাঢ় অন্ধকারে তলিয়ে থাকা সুপ্ত গ্রামের নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে কাছে কোথাও একটা কুকুর সুর তুলে তুলে কেঁদে ওঠে। শুনে হাসিনার বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে।

কুকুরের কান্না এক অশুভ অমঙ্গলের ইঙ্গিতবহ, সেকথা বাল্যকাল থেকে শুনে এসেছে হাসিনা। তার গ্রাম্য বিশ্বাসে তা দৃঢ়মূল হয়ে আছে।

তাই অমঙ্গলের লক্ষণ কাটাবার জন্য ভয়ে কাঁপা কণ্ঠে জোরে জোরে বলতে থাকে সে—দূর হ, দূর হ! পিছা মার্, পিছা মার্!

হর্ষবর্ধনের কিরিকেট • শিবরাম চক্রবর্তী

দুই ভাই-ই খেলোয়াড়!

ছোটবেলার সেই ধূলো খেলার কাল থেকে এখন অবধি এই খেলাধূলোর বয়েসে এসেও গোবরা তার দাদার সঙ্গে সমানে পাল্লা দেয়।

দুজনেই দারুণ স্পোর্টস্‌ম্যান, প্রায় সমান সমান, কেউ কারুর চেয়ে কম যায় না।

নিয়ে তুমি পারবে কি? যেও না বেহালায়, বেহাল হয়ে যাবে।

ভূরি ভূরি বাক্যব্যয়ের সে প্রয়োজন বোধ করে না—ঐ ভুঁড়িই যথেষ্ট।

তুই বলিস কী রে, আমি পারব না, পারি না, এমন জিনিস দুনিয়ায় আছে নাকি? কিরিকেট খেলতে আমি

হর্ষবর্ধন পাড়ার ছেলেদের স্পোর্টস্ ক্লাবের পেট্রন, আর গোবর্ধন তাদের ক্যাপ্টেন— কারো পাল্লাই কম ভারী নয়।

পাড়ার ছেলেরা ধরেছে এসে হর্ষবর্ধনকে। বেহালা বয়েজ-এর সঙ্গে ক্রিকেট ম্যাচে তাদের একজন কম পড়ছে, হর্ষবর্ধনকে তার শূন্যস্থল পূর্ণ করতে হবে।

পাড়ার অভাব মোচনে হর্ষবর্ধন সর্বদাই তৎপর, তক্ষুনি তৈরী, কিন্তু গোবর্ধন দাদাকে বাধা দেয়— ক্রিকেট হচ্ছে বেজায় দৌড়ঝাঁপের খেলা দাদা, এই বয়েসে ঐ ভুঁড়ি

জানি না বুঝি?—হর্ষবর্ধন সহর্ষে বলেন।

খুব পারবেন খুব পারবেন!—ছেলেরা তাঁকে মদত দিতে থাকে।

ক্রিকেট পারতে গিয়ে তুমি নিজেকেই পেড়ে ফেলবে মাঠে,—গোবর্ধনের সন্দেহ—তখন এই আড়াইমনী মাল আমাকেই ঘাড়ে করে বয়ে আনতে হবে।

আমরা আছি, আমরা আছি! আমরাও বইব, গোবরাদা।—গোবর্ধনকে উৎসাহ যোগাতে ছেলেদের কসুর নেই।

তোমরা যে আছো সে আমি ভালোই জানি ভাইরা! তখন যে যার নিজের বাড়ির পথে সুরুৎ! টিকিরও পাত্তা নেই কারু—গোবর্ধনের তিক্ত অভিজ্ঞতা।

হ্যাঁ, গোবরাদা যা বলেছো— সবাই তখন চড়াই পাখির মতো ফুরুৎ!—দলের একটা ছোট্ট ছেলে গোবর্ধনের কথার প্রতিধ্বনি করে— আমি বাবা ওই আলুর বস্তা বইতে পারব না।

আমি-আমি-আমি আলুর বস্তা! চলো আমি ক্রিকেট খেলে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের—হর্ষবর্ধনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ—আমি আলুর বস্তা না চালের বস্তা দেখতে পাবে।

কে বলে আলু আপনাকে? আপনি ক্রিকেটেও বেশ চালু।—ছেলেরা সব সমস্বরে সায় দিলো তাঁর কথায়।

কলকাতার স্থানাস্থানের ইতরবিশেষ আরো বিশদ করে গোবর্ধন বোঝাতে চাচ্ছিল দাদাকে, যাচ্ছিলও, উদাহরণসহ জানাতেও চাইছিল—কলকাতায় নেমেই তুমি ধরামতলায় ধড়াম করে পড়ে গেছলে কেন? মনে নেই? সে তো জায়গাটা ওই ধরামতলা বলেই। ওখানে গেলে অমনি করে তোমায় পড়তে হবেই। তেমনি উল্টে ডাঙ্গায় গেলে তুমি উল্টাবে, চিৎপুরে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়বে, বেহালায় গেলে বেহাল হতে হবে নির্ঘাত!

হই হবো, তোর কী? তোর নিজের বেহালা বাজা গে যা না তুই। যা!—বলে দাদা হৈ হৈ করে বেরিয়ে গেছেন পাড়ার ছেলেদের সাথে।

কথায় বলে আনাড়ির মার! ব্যাট ধরেই হর্ষবর্ধন প্রথমেই এমন হাঁকড়ালেন— বল একেবারে পগারপার!

প্রথম চোটেই এক ওভার বাউণ্ডারি!

চালান দাদা! চালান, চালান, চালিয়ে যান এমনি করে!— হৈ হৈ করে উঠলো সবাই।

চালাবোই তো! আলবৎ চালাবো।—হর্ষবর্ধনের হর্ষ ধরে না— কিরিকেট খেলতে জানিনে আমি!

ফার্স্টক্লাস খেলছেন দাদা! সত্যি মাইরি! গোবরাটা গেল কোথায়! দেখুক না এসে! দ্বিতীয় বলটাও যে মাঠ পার হয়ে গেল। দৌড়োন দাদা, দৌড়োন, দৌড়োন— হাঁকতে লাগলো ছেলেরা।

—না বাপু, ওই সব দৌড়ঝাঁপের ভেতর আমি নেই। এই স্থূল কলেবর নিয়ে ওই হুলুস্থুল আমার পোষাবে না।

তৃতীয় বলেও তাঁর ঐ কীর্তি।

—ছুটুন, ছুটুন! দাঁড়িয়ে কী করছেন?

কোথায় ছুটব? বল তো মাঠ পেরিয়ে গেছে, ওর কি আর নাগাল পাওয়া যাবে?—হর্ষবর্ধন কন—অকারণ ছুটোছুটি করে মরব কেন? আমি নতুন বল কিনে দেব না হয় তোমাদের।

—আহা, ঐ বলটা ছুটে আনতে বলছি না আপনাকে। দৌড়ে সামনের উইকেট পোস্ট ছুঁয়ে ঘুরে আসুন, ফের দৌড়ে যান। রান তুলতে হবে না?

অনর্থক হয়রান হয়ে কী হবে?—তিনি বাতলান—ওভার বাউণ্ডারি হলে চার রান হবে জানে সবাই। তার আবার তোলাতুলির কী আছে? ছয় রান হয়ে গেছে না ছুটতেই।

ছোটাছুটিকে তিনি ছুটি দিয়ে দেন।

তাঁর পরের মারটা অবিশ্যি বেশী দূর গড়াল না। মাঠের মাঝামাঝি গেল।

—এবার কিন্তু ছুটতে হবে দাদা। রান তুলতে হবে আপনাকে। এটা আপনার ওভার বাউণ্ডারি হয় নি কিন্তু।

না হোক। আণ্ডার বাউণ্ডারি হয়েছে তো? দু রান ধরে নাও তাহলে। না হক, হয়রান হতে পারব না ভাই।—হর্ষবর্ধন নিজের পোস্টে অনড়।

সবই কি আর ওভার বাউণ্ডারি হয় নাকি? মাঝে মাঝে আণ্ডার বাউণ্ডারিও হবে বৈকি। বেশির ভাগ তাই হবে ভাই। নবাব পাতাউদিরও তাই হয়। —হর্ষবর্ধন এক নবাবি চালে তাদের চুপ করিয়ে দেন—তোমরা দুরান দুরান করে ধরে নাও সব।

এমনি করে গোটা বিশেক রান তুলতে না তুলতে বোলারের একটা বল তাঁর উইকেটে এসে লাগলো—পড়ে গেল স্টাম্প্।

আউট! আউট!—অন্য পক্ষের ছেলেরা চেঁচাতে শুরু করল।

নট আউট, নট আউট!—আরো জোর গলা জাহির করেন হর্ষবর্ধন। কিন্তু তারা শোনে না, মানতে চায় না তাঁর কথা।

তখন তিনি 'ফাউল, ফাউল' বলে চেঁচাতে থাকেন।

ফাউল হয়েছে, অফ সাইড হয়ে গেছে।—ঘোষণা করে দেন হর্ষবর্ধন।

এ কি ফুটবল যে ফাউল অফ সাইড হবে?—তাদের বক্তব্য।

—নো বল, নো বল। আমাকে আরেকটা চান্স দিতে হবে। নইলে আমি খেলব না। খেলতে আসব না আর কক্ষণো। তোমাদের সঙ্গে আড়ি হয়ে যাবে আমার।

নিয়মবিরুদ্ধ হলেও সবাই মিলে একমত হয়ে ভোটের জোরে তাঁকে আরেকটা চান্স দিল তখন।

কিন্তু এবার বল মারতেই সেটা লাফিয়ে উঠল আর এক জন ক্যাচ ধরে ফেলল।

—ক্যাচ কট কট। আউট হয়েছেন দাদা।

নট আউট। বাইচান্স ওটা হয়ে গেছে। ও কিছু নয়।—হর্ষবর্ধন ব্যাট না ছাড়তে নাছোড়বান্দা।

তখন আরেক চান্স দেওয়া হোলো তাঁকে। আবারো তিনি ক্যাচ আউট।

আরেক চান্স। লাস্ট চান্স এবার—তিনি ধরে বসলেন।

ব্যাট ছাড়তে চাইলেন না কিছুতেই।

বললেন, আরেক চান্স দাও আমায়। চকোলেট খাওয়াব তোমাদের। এস্তার এস্তার। যতো চাই। যত খুশি।

চকোলেটের লোভেতে আরেক চান্স মিললো তাঁর তখন।

এবার তিনি খুব সতর্ক হয়ে ব্যাট করতে লাগলেন। ঠুক্ ঠাক্ ঠুক্ ঠাক্। কিছুতেই আর আউট হবার পাত্র নন।

বড় বড় মারের ধার-কাছ দিয়েও যান না। কি জানি, যদি ক্যাচ আউট হয়ে যান আবার!

তাহলেও ঐ মারেই এক আধটা বল বেশ এক-আধটু গড়ায়।

—দৌড়ান দাদা, দৌড়ান! রান তুলুন! রান তুলুন না।

—দৌড়াচ্ছেন না কেন?

হর্ষবর্ধন অনড়। নট্ নড়নচড়ন। ব্যাট ধরে নাছোড়বান্দা।

দৌড়ান দৌড়ান।—চারধার থেকে হৈ হৈ করে সবাই।

সবার প্ররোচনায় উত্তেজিত হয়ে যেই না একবার দৌড়তে গেছেন, অমনি কী হোলো কোথায় কে জানে, সবাই উঠল চেঁচিয়ে 'রান আউট! রান আউট!'

তাঁর পরের ছেলেটি ছুটে এসে তাঁর হাতের ব্যাট কেড়ে নিয়ে বলল, রান আউট হয়ে গেছেন দাদা, আর কোন চান্স নেই আপনার। এবার আমার পালা। ফিরে যান তাঁবুতে।

ছেলেটার তাঁবে ব্যাট ছেড়ে দিয়ে ম্রিয়মান হয়ে তাঁবুতে ফিরতে হল তাঁকে।

দূর দূর! এসব ভারী ঝকমারির খেলা, আমার এসব পোষায় না।—তিনি বকবক করেন।

খারাপ কী খেলেছেন দাদা! মন্দ কি এমন!—উৎসাহ দেয় একজন।

না বাপু। এসব লক্করদের ফক্করদের খেলা!—বিরক্ত হয়ে হর্ষবর্ধন দূর করে ছুড়ে ফ্যালেন হাত-পায়ের প্যাডগুলো—এসব আমার মতো ভদ্দর লোকের কম্মো না।

বিশেষ করে ভদ্রলোক যদি বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়।—তাঁর মনও সায় দেয় তাঁর কথায়।

বকতে বকতে মাঠ পার হয়ে রাস্তার একটা ট্যাক্সি ধরে চেতলায় নিজের আস্তানায় ফিরে যান সটান।

দোরগোড়াতেই গোবরার সঙ্গে মোলাকাত।

কোথায় ছিলিস রে এতক্ষণ!—দাদা কন, যেতে পারতিস আমার সঙ্গে। দেখতে পেতিস আমার খেলাটা। কীরকম খেললাম যে একখান!

কি রকম?—গোবরার ঈষৎ কৌতূহল।

গেলে দেখতিস!—দাদার উৎসাহ প্রকাশ পায়, ডাণ্ডা-গুলি হলে অবশ্য আরো ভালো খেলতাম। তাহলেও নেহাত মন্দ খেলিনি—ডাণ্ডাগুলির মতই দুদ্দাড় পিটিয়েছি। কিরিকেট কাকে কয় বেহালার পোলাদের দেখিয়ে দিয়েছি! তুই দেখতে পেলি না!

—তাহলেও শুনি না একটুখানি।

কটা বাউণ্ডারী করলাম জানিস? কটা ওভার বাউণ্ডারি? আর কটা ওভার ওভার?—দাদার বিবৃতি—'খবর রাখিস তার?

—ওভার ওভারটা কী আবার?

—ডবোল বাউণ্ডারি। তিন ডবল বাউণ্ডারি। আবার কী?

—ও।

—তা তুই কী করছিলিস এতক্ষণ কুড়ের মতন বাড়িতে বসে?

—বাড়িতে বসেছিলুম না। আমিও খেলেছি। খেলতে গেছলাম ম্যাচ। আমিও।

—তুইও ম্যাচ খেলেচিস? কী ম্যাচ রে? কিরিকেট?

—তোমার ওই কিরিকেট ছাড়া কি খেলা নেই আর? আমি পিং পং খেলছিলাম।

—পিং পং? সে আবার কি খেলা রে? নামও শুনিনি কক্ষনো।

—তুমি না শুনলেই বুঝি সে খেলা থাকতে নেই?

বায়স্কোপের কোন খেলা বুঝি?—দাদার ঈর্ষাজড়িত ঈষৎ কৌতূহল—কিংকং তো জানি একটা বায়স্কোপ। সেই রকম কোন খেলা বুঝি ঐ পিং পং?

সেও তোমার ঐ বল খেলাই মশাই! বল হাঁকড়ানোই। তবে বলগুলো ক্রিকেটের মতো অতো বড় বড় নয়, ছোট ছোট। ব্যাটগুলোও বেঁটেখাটো—গোবর্ধন জানায়, ভারী মজার খেলা গো!

—কোথায় গেছলি খেলতে? কার সঙ্গে খেলছিলিস?

—হিল্লি দিল্লি কোথাও না। টালাটালিগঞ্জ করতে হয়নি আমায়। এই পাড়াতেই খেললাম। পাটালিওলার ছেলের সঙ্গে খেলছিলাম এতক্ষণ—পাশের বাড়িতে।

পাটলিপুত্রে গিয়েছিলিস!—হাফ ছাড়েন দাদা—তাই বল্।

—তোমার সেই পাটনার নয় গো, জয়নগরের পাটলিপুত্রে। জয়নগরে থাকে ওরা, কী ফার্স্টক্লাস পাটালি গুড় ওদের,

[শেষাংশ ২৫৭ পৃষ্ঠায়]

দুর্দিনের সঙ্গী

মোহাম্মদ নাসির আলী

জেমস্ কলিয়ার নামে এক ইংরেজ যুবক চা-বাগানে ইঞ্জিনিয়ারের চাকরী নিয়ে আসাম যাচ্ছিলেন কলকাতা হয়ে। এর আগে কলকাতা তো দূরের কথা, ভারতেই কখনো আসেননি তিনি। কলকাতায় তখন ভয়ানক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে, সেই সঙ্গে চলছে লুঠতরাজ।

দাঙ্গাকারীরা ছাড়া ভাল লোক তখন কেউ রাস্তা-ঘাটে বেরোয় না প্রাণের ভয়ে। কলকাতার রাস্তায় রিক্‌শা-ট্রাম-বাস—সব বন্ধ। কলকাতা শহর যেন এক রূপকথার মৃতপুরী। রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে ইট, কাঠ, ভাঙ্গা আসবাব পত্রের টুকরো—আরো কতো কী টুকিটাকি জিনিস। জায়গায় জায়গায় মানুষের মৃতদেহও নজরে পড়ে দু-একটা। অনেকক্ষণ পরে পরে রাস্তায় টহল দিচ্ছে কর্তব্যরত দু-একখানা মিলিটারী গাড়ী।

মোটঘাট সব তিনটি কুলির মাথায় চাপিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে জেমস্ কলিয়ার চলেছেন কোনো একটা হোটেলের সন্ধানে। হাওড়া পুল পেরিয়ে তিনি বড়বাজারের সীমানায় পৌঁছেছেন, দেখলেন, সামনেই রাস্তার উপরে শুরু হয়েছে ভয়াবহ দাঙ্গা। তাই দেখে কুলিরা মাথার মোট রাস্তার পাশে ফেলে যে যেদিকে পারলো প্রাণ নিয়ে পালালো। উপায়ান্তর না দেখে বেচারা জেমস্ কলিয়ারও দাঁড়ালেন এসে সদ্য-লুণ্ঠিত একটা পুস্তকের দোকানের সামনে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে। ভয়ে তখন তিনি রীতিমত কাঁপছেন।

সেই সময় দাঙ্গাকারীদের কয়েক গজ দূরে তিনি দেখতে পেলেন, ছোট্ট একটি ছেলে হিন্দুস্থানী ভাষায় চীৎকার করতে করতে তাঁরই দিকে ছুটে আসছে। ছেলেটির বগলে একটি কুকুরের ছানা। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, কুকুরের বাচ্চাটি তার খুবই প্রিয়। প্রিয় বলেই সমস্ত সম্পদ ফেলে কুকুরের বাচ্চাটি নিয়ে সে পথে নেমেছে। ছেলেটি কোনো ক্রমে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে সেই ময়লা বাচ্চাটি জোর করে জেমসের হাতে তুলে দিয়ে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। দাঁড়াতেই কয়েকজন গুণ্ডা এসে লাঠির ঘায়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর

জেমসের চোখের সামনেই ছেলেটাকে মেরে ফেলল পা দিয়ে মাড়িয়ে। কলকাতায় পা দিয়েই এমন একটা ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে হবে এমন কল্পনাও জেম্‌স্ করেননি।

ঘটনাটা ঘটেছিল চীৎপুর মোড়ের কাছাকাছি। একটু পরেই দূরে মিলিটারী গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। তাই শুনে দুষ্কৃতকারীরা মুহূর্তের ভেতর এদিক-ওদিক গলি ঘুঁজিতে সরে পড়ল। অতঃপর কী করা যায় জেমস্ কলিয়ার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাই ভাবতে লাগলেন। খাকী পোশাকে সজ্জিত একদল রাইফেলধারী সৈনিক নিয়ে একটা মিলিটারী গাড়ী শেয়ালদার দিক থেকে এদিকেই আসছিল। জেমস্ ভাবলেন এদের সাহায্যে একটা নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চয়ই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মিলিটারী গাড়ীটা সে অবধি না এসে সহসা চীৎপুর রোডে ঢুকে পড়ল।

অগত্যা জেমস্ তাঁর মোটঘাট কুড়িয়ে নিয়ে নিজেই অতিকষ্টে বয়ে নিয়ে ফিরে চললেন হাওড়া স্টেশনের দিকে। সেখানে ফিরে যেতে পারলে অন্তত নানা রকম লোকজনের মুখ দেখা যাবে, একটা উপায়ও হয়ে যেতে পারে। ঠিক সে সময়ে কুলি তিনজন কোথা থেকে যেন ফিরে এসে আবার মোট মাথায় নিল। তাদের সাহায্যে অবশেষে তিনি হাওড়া স্টেশনেই ফিরে এলেন।

কুকুরছানাটা তখনো যে তাঁর হাতেই রয়েছে এতক্ষণ তাঁর তা খেয়ালই হয়নি। স্টেশনের পথে একবার সেটাকে ফেলে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কুকুর কিছুতেই কলিয়ারকে ছাড়বে না।

অসহায় কুকুরের মনের ভাবটা সহজেই তিনি বুঝতে পারলেন। তাই দু-তিন বার মৃদুভাবে মাথা চাপড়ে দিতেই কুকুরের বাচ্চাটা লেজ নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করলো এবং মাথা তুলে করুণভাবে কলিয়ারের দিকে চেয়ে কৃতজ্ঞতা জানালো। সঙ্গে সঙ্গে কলিয়ারেরও মনে হল, একে কিছুতেই এভাবে পথে ফেলে যাওয়া উচিত হবে না।

এমনি ভাবেই বেচারা জেমস্ কলিয়ার কুকুরছানাটির মালিক হয়ে গেলেন। মনে মনে তিনি একটু হাসলেন। ইঞ্জিনিয়ার মানুষ তিনি। জীবনে কখনো কুকুর পুষবেন, দুঘণ্টা আগেও তা ভাবতে পারেননি। তিনি কুকুর তেমন পছন্দও করতেন না, তাছাড়া চা-বাগান কুকুর পোষার উপযোগী জায়গা কিনা তাও তিনি জানেন না। তবু সঙ্গী হিসাবে একটি কুকুরছানা সঙ্গে নিয়েই আসামের চা-বাগানে একদিন গিয়ে তাঁকে হাজির হতে হল।

তারপরে কী ঘটেছিল সে কাহিনী কলিয়ার নিজেই বলেছেন :

ট্রেনের দীর্ঘপথ ছাড়িয়ে স্টীমারে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে আমরা যখন আসামে এসে পৌঁছেছি, ততক্ষণে আমাদের দুজনার মধ্যে অর্থাৎ কুকুরছানা ও আমার মধ্যে বন্ধুত্বটা বেশ জমে উঠেছে। পরস্পরকে আমরা তখন বেশ ভাল-ভাবেই চিনে ফেলেছি।

আসামের তিনসুকিয়া স্টেশনে পৌঁছে দেখতে পেলাম, হুডবিহীন একখানা নড়বড়ে ভাঙ্গামতো সেকেলে ফোর্ড মোটর গাড়ী আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি মোটরে গিয়ে উঠতেই কুকুর ছানাটিও একলাফে এসে আমার পাশে বসল। বসল এমন ভাবে যে, বরাবরই যেন ও মোটরে চড়ে বেড়াতে অভ্যস্ত। আমি মনে মনে একটু হাসলাম ওর এ নবাবীপনা দেখে।

কুকুরের একটা নাম রাখা দরকার। আমি তাই নিজে নিজেই ওর নাম রেখেছিলাম 'স্ক্রাফ'। দুদিন পরেই ও স্ক্রাফ নামে সাড়া দিতে শিখল।

একটু পরে আমার গন্তব্যস্থল চা-বাগান নজরে পড়ল। জীবনের প্রথমে এই দেখলাম দিগন্ত-বিস্তারী চা-বাগান। আসছে পাঁচটি বছর এ চা-বাগানই হবে আমার ঘরবাড়ী।

মোটরখানা বাংলোর প্রবেশ পথে এসে থামতেই সহাস্য করমর্দন করতে এগিয়ে এলেন বাগানের ম্যানেজার মিঃ লেন বেলামী। তাঁর সঙ্গে প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ফিল স্কট্। ফিল স্কটের জায়গাতেই আমি বহাল হয়েছি। ম্যানেজার বেলামী বেশ হাসিখুশি আমুদে মানুষ। ফিল স্কটও তাই। করমর্দনের পালা শেষ হলে আমরা যখন এগিয়ে চলেছি বাংলোয় ঢুকতে, ততক্ষণে স্কটের নজর পড়েছে কুকুরটার উপর। তিনি হেসে বলে উঠলেন, বিশ্রী এ জানোয়ারটা আবার কোথা থেকে এখানে এসে জুটলো? নিশ্চয়ই এটা তোমার সাথী নয় মিঃ জেমস্?

বলেই তিনি সশব্দে হেসে উঠলেন। জেমস্ বললেন, কিন্তু যদি বলা হয় নিশ্চয়ই ও আমার সাথী, তাহলে আপনারা কি বিশ্বাস করবেন না?

তারপর আমি আনুপূর্বিক কলকাতার করুণ ঘটনা বন্ধুদের কাছে চা খেতে খেতে খুলে বললাম। বলে জিজ্ঞেস করলাম, আমার এ দুর্দিনের সঙ্গীকে চা-বাগানে রাখতে কোন বাধা নেই তো?

ম্যানেজার বললেন, যদি চায়ের চারাগাছ নষ্ট না করে, তবে রাখতে পারবে বই কি। কুলিবস্তিতে তো অনেক কুকুরই রয়েছে।

সে ব্যাপারে অবশ্য আমি সতর্ক দৃষ্টি রাখব বলে ম্যানেজারকে আশ্বস্ত করলাম।

এ বাগানে আমরা তিনজনই শুধু ইউরোপবাসী। কম করেও প্রায় এক হাজার একর জমির উপর এ-বাগান। তিন হাজার কুলি এখানে কাজ করে। কথায় কথায় জানলাম, মাঝে মাঝে শিকারে বের হবার বেশ সুবিধে আছে এখানে। বাঘ-চিতাবাঘের ভয়ঙ্কর গল্পও অনেক শুনলাম। যতক্ষণ আমরা গল্পগুজবে কাটালাম স্ক্রাফ চুপচাপ আমার দুপায়ের ফাঁকে বসে রইল।

এর পর থেকে বাংলোর ভেতরে বা বাইরে যখন যেখানে আমি গিয়েছি, স্ক্রাফ সারাক্ষণ ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছে। কিছুদিনের ভেতর স্বভাবতই ও আমাদের খুবই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। রাত্রে খাটের তলায় আমার পায়ের কাছে ও ঘুমিয়ে থাকত। রাত্রে কোথাও একটু শব্দ হলেই আমার ঘুম ভাঙতে কসুর করত না।

আমি যখন চা চাষের সমুদয় খুঁটিনাটি বুঝে নিতে ব্যস্ত, স্ক্রাফ তখন বাগানের আশপাশ ঘুরে ফিরে দেখে বেড়াত।

একদিন আমরা তিনজন—সঙ্গে স্ক্রাফও রয়েছে—নদীর পাড়ে বেড়াতে বেরিয়েছি। ঠিক বেড়াতে নয়, শিকার খুঁজে বেড়ানো আমাদের উদ্দেশ্য। শিকার করে ফিরে আসবার সময় আমার একমাত্র বাহন সেই লক্করমার্কা ফোর্ড খানা হঠাৎ এক জায়গায় এসে থেমে গেল। একেবারে অচল। মোটরের এ বিদঘুটে অভ্যাস আজকের নতুন নয়। অগত্যা আমরা তিনজন নেমে সেই অচল মোটর সচল করার চেষ্টায় লেগে গেলাম। কর্দমাক্ত ঢালু পথ। আমাদের ধাক্কায় মোটর স্টার্ট নিলেই আমরা লাফিয়ে উঠি, এই আমাদের নিত্যকার অভ্যাস।

আজকে মোটর ঠেলতে গিয়ে আমি ও স্কট স্টার্টের সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে পড়লাম, কিন্তু বেলামী বেচারা উঠতে পারলেন না। তাঁকে ফেলেই মোটর বেশ কিছু দূর এগিয়ে এল। স্কট মোটর চালকের পাশে বসেছেন, আমি বসেছি তাঁর পাশে। ম্যানেজার যখন দৌড়তে দৌড়তে রাস্তার একটা মোড় ঘুরেছেন, ততক্ষণে আমরা মোটর থামিয়েছি। মোটর থেকে অনুমান ত্রিশ ফিট দূরে গাছের একটা ভাঙা ডালে পা বেধে তিনি হোঁচট খেয়ে পড়লেন। পরমুহূর্তেই হাসতে হাসতে আর গাছের ডালটিকে অভি-সম্পাত দিতে দিতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

কিন্তু আমাদের দিকে দৌড়ে আসতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন তিনি। কয়েক ফুট দূরে কী একটা বস্তুর উপর তাঁর আতঙ্কিত দৃষ্টি নিবদ্ধ। সে জায়গাটা নিবিড় ঘাসে আচ্ছাদিত। দূর থেকে কিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ম্যানেজারের চোখ-মুখ ততক্ষণে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। তারপর খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে তিনি পিছু হটতে লাগলেন। সহসা তাঁর এই অস্বাভাবিক আচরণের কারণ আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। কিন্তু স্কট হঠাৎ আমার পাশ থেকে চীৎকার করে উঠে প্রকাণ্ড একটা সাপের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করালেন।

জীবনে কখনো কোন রাজগোখরো সাপ আমি চোখে দেখিনি। আজ চোখের সামনে এ ভীষণ জীবটিকে দেখে গায়ের সমস্ত রক্ত যেন আমার জমে গেল—আতঙ্কে আমি যেন কিছুতেই ঠিক থাকতে পারছিলাম না। বেলামী ততক্ষণে বেশ কিছুটা পিছিয়ে এসেছেন। তাঁর ডান হাতটা কোমরের দিকে কী যেন খুঁজছে—বোধ হয় তাঁর পিস্তল। কিন্তু পিস্তল আমরা কেউ সেদিন সঙ্গে নিইনি। শিকারের জন্যে যে রাইফেল আমরা নিয়েছিলাম তা কুলিরা আগেই বাংলোয় নিয়ে গেছে। গোখরো সাপটার গায়ে ছুঁড়ে মারব তেমন কিছুই আমাদের গাড়ীতে নেই। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে থাকা ছাড়া করণীয় কিছুই আমাদের নেই। সাপটা ততক্ষণে তার ফণা তুলেছে প্রায় চার ফুট উঁচুতে। কম করেও বারো ফুট দীর্ঘ হবে তার দেহ। ফণা তুলে আক্রোশে ফোঁস ফোঁস করছে আর ডাইনে বাঁয়ে দুলছে। মিঃ বেলামীও যেন এ ভয়াবহ অবস্থায় পড়ে হতভম্ব হয়ে গেছেন। কোমরের উপর ডান হাত রেখে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন পাথরের একটা নিশ্চল মূর্তির মত। ঠিক সেই মুহূর্তে

সাদা-কালো কী একটা ক্ষুদ্র জীব তীরবেগে ছুটে এসে পড়ল গোখরোটার উপর। চমকে দেখি, আমাদের স্ক্রাফ। সবার অলক্ষ্যে গাড়ীর পিছন থেকে সে লাফিয়ে পড়েছে।

অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হয়ে গোখরোটা ক্ষণিকের জন্যে একটু থতমত খেল, তারপর সজোরে ছোবল মারতে উদ্যত হল স্ক্রাফের গায়ে।

বেলামীও ততক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছেন। এক লাফে অনেকখানি পিছিয়ে এসে তিনি প্রাণপণে ছুটলেন গাড়ীর দিকে। ওদিকে স্ক্রাফ শূন্যে লাফিয়ে উঠে আত্মরক্ষা করেছে, সাপের প্রথম ছোবল তার গায়ে লাগে নি। হয়তো লোমশ গায়ে ছোবল লাগলেও তার কোন অনিষ্ট হত না। অসহ্য ক্রোধে গোখরোটা ফোঁস ফোঁস করতে করতে আবার ছোবল মারল, কিন্তু আবারও ব্যর্থ হল। অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়ে সে একটা বাঁশ ঝোঁপের মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্ক্রাফ অবশ্য কিছুদূর অবধি সাপের পিছু পিছু ধাওয়া করল। কিন্তু ঝোঁপের ভেতর অদৃশ্য হবার পরে কিছুক্ষণ সে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সাপটা হয়তো আবার ওকে ছোবল মারার চেষ্টা করতে পারে, এ আশঙ্কায় ওর নাম ধরে ডেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। ফিরে এসে কুকুরটা কিন্তু অসীম আনন্দে আমাদের দিকে চেয়ে লেজ নাড়াতে লাগল।

এই বোবা জীবটাকে কিভাবে আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাব, বুঝতে পারছিলাম না। আমরা শুধু ওর পিঠ চাপড়ে দিলাম আর আদর করে গা মলে দিলাম। রাত্রে খাবার সময় আমাদের বরাদ্দ থেকে অনেকখানি হরিণের মাংস সেদিন ওকে খেতে দিয়েছিলাম।

তারপর কিছুদিন কেটেছে, জুন মাস ঘনিয়ে এল। এবারে আসামে বৃষ্টি আরম্ভ হবে অবিরাম ধারায়। তখন আর বাইরে বেরোবার উপায় থাকবে না। এই অবসরে মিঃ বেলামী ছুটিতে গেছেন কলকাতায় বেড়াতে বাগানে রয়েছি আমি আর মিঃ স্কট। স্কটই একদিন প্রস্তাব করলেন, এ সময়ে আশেপাশে কোথাও একবার শিকারে যাওয়া দরকার। আমিও এ রকম একটা প্রস্তাবেরই প্রত্যাশা করছিলাম। এক সপ্তাহ ধরে চলল আমাদের শিকারে বেরোবার প্রস্তুতি।

যেদিন আমাদের শিকারে রওনা হবার কথা, সেদিন ভোরে বাগানের এক চৌকিদার হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল, রাত্রে বাঘ এসে তার একটা ছাগল নিয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ আমি আর মিঃ স্কট ছুটে গেলাম তাদের বস্তিতে। চৌকিদারের উঠোনে কালো নরম মাটির উপর বাঘের পায়ের দাগ স্পষ্ট দেখতে পেলাম। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পায়ের সেই দাগ জঙ্গল অবধি গিয়েছে।

স্কট সেই পায়ের দাগগুলো পরীক্ষা করে বললেন, এগুলো বাঘের পায়ের দাগ নয়। এ দাগ সেই চিতাবাঘটার যেটার কথা তোমাকে বলেছিলাম সেই প্রথম যেদিন তুমি এলে। এ চিতাবাঘটা ছাগল-ভেড়া মারতে খুবই ওস্তাদ। এটাকে কাবু করা সহজ ব্যাপার হবে না। মাচা তৈরি করলে তার ত্রিসীমানায় সে আসবে না। ওকে ধাওয়া করতে হবে পায়ে হেঁটে। কিন্তু তুমি নতুন মানুষ, তুমি সুবিধে করতে পারবে কি?

আমি বললাম, বিপদ যতই হোক, আমি না গিয়ে ছাড়ছি না।

মিঃ স্কট হেসে বললেন, হ্যাঁ, তুমি তা বলবে আগেই জানি। কিন্তু তোমার ঐ কুকুরটাকে আগে বেঁধে রাখ। ওটাকে কিছুতেই আজ সঙ্গে নেওয়া উচিত হবে না।

তাঁর কথামতো কুকুরটাকে আমি চৌকিদারের কুঁড়েঘরের একটা খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলাম। তারপরে দুজনে যাত্রা করলাম।

চিতাবাঘটা অনেককাল ধরে এ অঞ্চলে জ্বালাতন করছে। মানুষখেকো চিতাবাঘ। গত কবছরে কয়েকটা মানুষও হত্যা করেছে। বছর কয়েক ধরেই বেলামী চিতাবাঘটার পেছনে লেগে আছে, কিন্তু করতে পারেনি কিছুই। একবার মাচা থেকে গুলি করে ওকে জখমও করা হয়েছিল। তারপর থেকে সে মাচার ধারে-কাছে এসেছে বলে শোনা যায়নি। দাগগুলো দেখলে সহজেই বোঝা যায়, ওর একটা পা সামান্য খোঁড়া। সামনের বাঁ পায়ের দাগগুলো অন্যগুলোর তুলনায় কিছুটা অগভীর।

স্কট আগে আগে চলেছেন, আমরা চলেছি তাঁর পিছনে। ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পায়ে-চলা পথে কিছুদূর এগিয়ে ছোট্ট একটা মাঠের মত। সেখানে লম্বা লম্বা ঘাসের বন। তার ভেতর বাঘের পায়ের দাগ খুঁজে বের করা আর সম্ভব নয়। পাশেই রয়েছে একটা গাছ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, বাঘ শিকারের বাহাদুরী বোধ হয় আমাদের ভাগ্যে নেই। ওদিকে কুলিদের কিন্তু অটল বিশ্বাস আমাদের উপর—বাঘ আমরা শিকার করবই। ওদের কাছে ব্যর্থতার কথা বলতেও লজ্জা করে।

কিন্তু আমার বিশ্বাস ভেঙে দিলেন মিঃ স্কট। শঙ্কিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, হুঁশিয়ার হয়ে আমার পেছনে নজর রেখো কলিয়ার। আমি চারদিক একটু ভালভাবে দেখি। শয়তানটা আমাদের খুব ধারে-কাছেই যেন আছে মনে হচ্ছে।

আসলে কিন্তু আমরা যতটা ধারে-কাছে আছে বলে মনে করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক কাছেই ও ছিল। সে ব্যাপারটা আমরা টের পেলাম একটু পরেই।

মিঃ স্কট বোধহয় তখন আনুমানিক ত্রিশ ফুট এগিয়ে গেছেন, এমন সময় অকারণেই আমি গাছটার দিকে একবার চোখ তুলে চাইলাম। মুহূর্তে আমি পাথর!

আমার মাথার ঠিক চার ফুট উপরে আগুনের মত জ্বলছে দুটি চোখ। একটা ডালের উপর সটান হয়ে শুয়ে ও চেয়ে আছে আমার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে।

সব সময়েই মনে করেছি, বিপদে-আপদে অচঞ্চল থাকব, কিন্তু কাজের বেলা তা আর হয়ে ওঠে না। ভয়ে উত্তেজনায় আমি থর থর করে কাঁপতে লাগলাম। অবশেষে চীৎকার করে ডাকলাম স্কটকে। তারপরে তিন-চার পা ডাইনে সরে গিয়ে ছুঁড়লাম গুলি, কিন্তু গুলি ওর গায়ে লাগল না, বন্দুকের ধাক্কায় আমিই বরং পড়ে যাচ্ছিলাম চিৎপটাং হয়ে। বাঘটা ততক্ষণে লাফিয়ে পড়ে আমাকেই আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। স্কট আমার পেছন থেকে একবার গুলি ছুঁড়লেন, কিন্তু তিনিও বাঘের গায়ে লাগাতে পারলেন না। আমার জীবনের আর কোনো আশা নেই বলেই আমি ধরে নিয়েছি তখন।

এমন সময় কেমন একটা গোঁ গোঁ শব্দ শুনতে পেলাম। চোখ তুলে দেখি, কোথা থেকে স্ক্রাফ এসে বাঘটার টুঁটি চেপে ধরেছে! কয়েক ইঞ্চি পরিমাণ ছেঁড়া দড়ি তখনও তার গলায় ঝুলছে।

এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি কিভাবে ঘটতে যাচ্ছিল, এখন তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। স্কট ও আমি কয়েকটা গুলি ছোঁড়বার পর বাঘটা পড়ে গেল। কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল সে। স্ক্রাফ তার শত্রুর এ দশা দেখে আনন্দে রীতিমত নাচতে লাগল। আমরা কিন্তু সতর্ক হয়েই এক পা দুপা করে বাঘের দিকে এগোচ্ছি—যদিও জানি যে শয়তানটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই অক্কা পেয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের ধারণা ছিল ভুল। মৃত্যুর পূর্বে শেষ চেষ্টার মত বাঘটা সহসা প্রচণ্ড এক থাবা মারল স্ক্রাফের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা ঢলে পড়ল মাটিতে—একটিবার চীৎকার করে উঠবারও ক্ষমতা হল না হতভাগ্য জীবটার!

চিতাবাঘের মৃতদেহ সেখানেই পড়ে রইল। আমি আর স্কট মৃত স্ক্রাফকে বাংলোয় বয়ে নিয়ে এলাম বিমর্ষ মনে। বাংলোয় এসে অতি যত্নে তাকে সমাহিত করলাম। তারপর একটি কাষ্ঠফলকে নিজহাতেই লিখে দিলাম—'অতুলনীয় স্ক্রাফ'।

হর্ষবর্ধনের কিরিকেট

[২৫২ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

কী বলব দাদা! খেজুর গুড়ের পাটালি।

দাদার জিভে জল সরে—খেলি পাটালি গুড়?

—না খেয়ে ছেড়েছি নাকি? এস্তার খেয়েছি। ওই লোভ দেখিয়েই তো নিয়ে গেল ছেলেটা খেলতে। নইলে কি আর এই শর্মা যায়!

—তা কী রকম ফাটালি? ঐ পিং পং।

—ফাটাফাটির খেলা নয় দাদা! এ খেলা টুকটাক। এ তো তোমার কিরিকেট কি ডাংগুলি নয় যে ফাটাব। ভদ্দরলোকের খেলা বুঝলে? বলতে পারো ভদ্র বালকদের।

—বটে বটে? কী রকম খেলাটা শুনিই না। খেলাটা হয় কোথায়? মাঠে?

—মাঠে নয়, হাটেও না, বলতে পারো খাটেই বরং।

খাটে আবার কিসের খেলা রে!—হর্ষবর্ধন অবাক হন।

খাটের তলাতেই বেশির ভাগ। আসলে খেলাটা হয় একটা টেবিলের ওপর, কিন্তু আসল খেলাটা তোমার ঐ খাটের তলাতেই।—গোবর্ধন প্রকাশ করে—ছেলেটা একটা বল মারে। একটুখানি বল। একটুতেই হারিয়ে যায়। খাটের তলায় চৌকির তলার থেকে খুঁজে আনতে হয় গিয়ে। বল মারবার পর আমি আর ছেলেটা চৌকির তলায় ঢুকি গিয়ে, সেখান থেকে খুঁজে আনি বলটা। তার পর আমি একটা বল মারি। আবার সেটা চৌকির তলায় গিয়ে সেঁধোয়। ভারি মজার খেলা দাদা!

এর ভেতর মজাটা কোন্‌খানে?—হর্ষবর্ধন কোনো হদিস পান না। হাঁ করে থাকেন।

—মজা ঐ চৌকির তলাতেই। বুঝছ না?

—সেখানে তো যতো আরশোলা। আরশোলাতে তুই মজা পাস বুঝি? আমার বাপু গা ঘিনঘিন করে ওদের দেখলে। ভারী ভয় লাগে।

—আরশোলা কেন গো? তার তলাতেই তো যতো মজা। সাজানো যত, থরে থরে বিন্যস্ত যত গুড়ের পাটালি গো!

—পাটালিওলার পাটালি সব ফাটালি—অ্যাঁ?

—আজ রাত্তিরে আর ভাত টাত কিছু খাচ্ছি না দাদা! আমিও না, তোমার সেই পাটলিপুত্রও নয়। সাঁতখানা ইয়া ইয়া পেল্লায় পাটালি দুজনে মিলে সাবাড় করেছি।

তারপরই গোবর্ধন এক পাটনাই ঢেঁকুর তুলে তার প্রমাণ দিল।

উত্তর আমেরিকার 'গ্রিজলি' ভালুক বড় সাংঘাতিক জীব। আগ্নেয়াস্ত্রের যখন উন্নতি হয়নি, সেই সময় বহু শিকারী গ্রিজলি শিকার করতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে প্রাণ হারিয়েছেন। এমন ভীষণ জন্তুও অনেক সময় দলবদ্ধ নেকড়ের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জয়-পরাজয় অবশ্য অনিশ্চিত, তবে পছন্দমতো জায়গা নিয়ে রুখে দাঁড়াতে পারলে অধিকাংশ সময় ভল্লুকই জয়লাভ করে।

অরণ্যের অন্তরালে • ময়ূখ চৌধুরী

কবিতাগুচ্ছ

চলচ্চিত্র চতুর্দশী • বিমলচন্দ্র ঘোষ

ভদ্রলোক রোজ যান পূব থেকে পশ্চিমে সকালে,
সন্ধ্যায় পশ্চিম থেকে পূবে যান সাবধানে পা ফেলে!
সকালে নিমের ডালে কাক একটা যা চায় না পেলে
কক্ কক্ শব্দ করে; মারা গেল অর্জুন অকালে।

মেজাজ থাকে না ভালো অকারণে কেবলি বকালে,
ক্ষুধার্ত বৈকুণ্ঠ মুচি ছাতু মুড়ি যা পায় তা গেলে
জুতো রেখে, ঘরে তার সদ্যোজাত বাচ্চাটা ককালে
নিরুপায় বৌ জানে বুকে দুধ আসে না না খেলে।

খেঁকুরে গয়লানী বুড়ি খোলা মাঠে গরু ছেড়ে রাখে
বেঁজিটার কী সাহস দিন দুপুরে বাগানে বেড়ায়।
লাল ফুল ফুটে আছে কাঁটালতা জড়ানো বেড়ায়
অসুস্থ বৌ নিয়ে শাশুড়ী সাইকেল রিক্সা ডাকে

হাসপাতালে যাবে বলে। টবশুদ্ধ 'অর্কুরিয়া কুকি'
সুনু ঘোষ দিয়ে গেল; পড়ে গিয়ে ঠোঁট কাটে খুকি।

স্বপনতরীর দেশ • বারীন বসু

ঘুমের ঘাটে স্বপনতরী,
লাগবে বলো ক পণ কড়ি,
পৌঁছে যেতে অনেক দূরে মেঘমেলায়।
ঐ যেখানে চাঁদনী ফুটে,
জোছ্না-রূপো ঝিকিয়ে উঠে,
কালোয় আলো মিশিয়ে কত রঙ খেলায়।
হাসির পরী, খুশীর পরী
এ ওর হাতে হাতটি ধরি,
আজকে রাতে মেঘমেলাতে আসবে তাই—
জোছনা-রূপো আয়না জুড়ে,
রূপের সোনা পড়বে উড়ে
রূপ-পরীরা আহ্লাদেতে ভাসবে তাই।
কোন্ পাহারা তাড়ায় তাকে?
বর চেয়ে যে দাঁড়ায় তাকে,
তার কপালে নাচছে সেরা চিচিং ফাঁক।

পরীর যাদু অবাক সুরে
এক নিমেষে দেয় যে পুরে
বল্গা-হারা ইচ্ছে বুকে যতই থাক।
শূন্যে ঘাটে স্বপনতরী—
মিথ্যে আশা বপন করি,
কোথায় বলো কোথায় তুমি কোন্ সে দেশ?
খুঁজতে গিয়ে তোমায় দেখি
পূব দুয়ারে ফুটছে এ কি!
রাত ফুরোনো চাঁদ ডুবোনো দিনের রেশ।
সব শুনে মা বললে কি তা
শুনতে পেলে অচিন মিতা?
মিথ্যে খোঁজা, মিথ্যে ছোটা দিক্‌বিদিক্।
মনের ঝাঁপি তোমার বাসা,
রাখলে তাকে ফুর্তি ঠাসা,
আপনি এসে দাও যে ধরা দাও যে ঠিক।

সেই খুশি নেই আর ● বিশ্বপ্রিয়

সেই খুশি নেই আর আগেকার মত,
পাই না তেমন করে শিউলির বাস,
আমাদের কালে ঠিক যেমনটি হত
আঙনে দাঁড়ালে এসে আশ্বিন মাস।
সেই নদী-তীর ঘিরে ঝির্‌ঝিরে বায়
একরাশ কাশ ফুল দুলতো যেমন,
সেই অপরূপ ছবি আজকে কোথায় ?
দুচোখ মেলেও কিছু দেখি না তেমন !
দেখি শুধু ঘরে ঘরে অভাবের ঝড়—
ফাঁকা মাঠ, ফাঁকা হাট, ধু-ধু চারিপাশ···
বুকে বড় দাগা দেয় দোয়েলের স্বর,
কী বিষাদে ভরে ওঠে সোনালী আকাশ
জীবিকার চাপে পড়ে মানুষের মন,
এ যুগে কি পায় খুঁজে আলো-হাসি-গান ?
পৌষালী আনে না প্রাণে খুশির মাতন,
কচি মুখগুলো আজ শোকে ম্রিয়মাণ।
বহুদিন গত হল—মিলেছে স্বরাজ
তবু শত হীনতায় ভুগছি সবাই,
বুঝি না সে কার পাপে সবুজ-সমাজ,
জ্বলে-পুড়ে এইভাবে শুধু হয় ছাই !
শাপলা-শালুক ফোটা সোনা-ধানী দেশ,
দীন ভিখারীর মত কী যে তার হাল !
মনে-প্রাণে আজ তাই কামনা অশেষ :
আবার আসুক সেই সোনালী সকাল।

ছড়া ● প্রমোদ সাহা

পৌষ বুড়ী পৌষ মাসি
মিষ্টি রোদে মিষ্টি হাসি
এলে তুমি বছর পরে
ছাড়ি তোমায় কেমন করে।
এনেছ কি ফলের ঝুড়ি
নতুন ধানের মুড়কি মুড়ি ?
রসপুলি আর আকসে পিঠে
নলেনগুড়ের মণ্ডামিঠে
এনেছ কি সঙ্গে করে ?
ক্ষীরের নাড়ু আঁচল ভরে ?
সবুজ ক্ষেতে কড়াইশুঁটি
দাও ছড়িয়ে মুঠি মুঠি,
দাও ছড়িয়ে গাঁদার বনে
আলপনা, রঙ সবার মনে।

ক খ গ ● রঞ্জন প্রসাদ

ক খ ছিল রাজা রাণী, গ ছিল এক গোলাম,
উঠতে বসতে গ-কে কেবল ঠুকতে হতো সেলাম।

গ একদিন ক-কে ধরে দিল বেজায় মার,
বলল, "আমার রাজা হবার সমান অধিকার।"

খ-কে রাণী করে গ বসল সিংহাসনে,
মনের দুঃখে ক বেচারা পালিয়ে গেল বনে।

ইতিহাসের পাতায় আছে এমন কত মজা
ঝগড়াঝগড়ি লেগেই আছে রাজা বনাম প্রজা।

শেষের লড়াই খতম হবে এইটে লিখে গেলাম,
থাকবে না কেউ রাজা রাণী, ঠুকবে না কেউ সেলাম।

অশোককুমার সেনগুপ্তের
সম্পূর্ণ
উপন্যাস

সোনাচরে সো না চো র

॥ এক ॥

শুকের দারুণ ভাল লেগে গেল। চমৎকার জায়গা। কলকাতা থেকে দুশো-সওয়া দুশো কিলোমিটারের দূরত্ব। শুক তো ভাবতেও পারেনি এমন অদ্ভুত সুন্দর একটা জায়গা আছে!

বেড়াবার নাম শুনেই তুবড়ির মত জ্বলে উঠেছিল বুকের ভিতরটা অদ্ভুত এক উল্লাসে। তারপর যখন শুনল বাইরে বেড়াতে যাওয়া মানে দার্জিলিং নয়, কাশ্মীর নয়, পুরী কি বোম্বাই নয়, দিল্লী আগ্রা নয়, এমন কি দীঘা কি কাকদ্বীপ নয়, তখন হুস করে হাউইয়ের মত নিবে গিয়েছিল। কিন্তু না এলে কী ভীষণ যে ঠকে যেতে হত!

শুক ছবিতে গাঁ দেখেছে। ইস্ ছবির গাঁয়ের সঙ্গে সত্যিকারের গাঁয়ের কত না তফাত! এই সোনার গাঁ-খানা সহর থেকে মানে মফস্বল সহর থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে। মাইল নয়েক বাসে আসা যায়। তারপর মাটির হাঁটা পথ।

গাঁয়ের কথা পরে। বাস থেকে নেমে সোনাচর পর্যন্ত মাটির সড়কটাই কি কম মনোরম! তার উপর গরুর গাড়িতে চড়ে। ধানক্ষেত আর ধানক্ষেত। খানিকটা যাওয়ার পর আমের বাগান, তারপরই ক্ষুদে শালের সবুজ ঝালরের মত পাতা ঝুলিয়ে সুন্দর একটা বন, কুলের ঝোঁপ, কুশের ঝাড় দুপাশে। মাঝে আবার নদী পড়ল একটা। শুধু সাদা বালি। একধারে তিরতির করে জল বইছে। শুকের দুচোখ মুগ্ধতায় ঝিলমিল করছিল।

শুক এই প্রথম গরুর গাড়ীতে চড়ল। বাস স্ট্যাণ্ডের অশ্বত্থতলায় ছাউনি দেওয়া গরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল কাকাবাবুদের। ভেতরে খড় পাতা, তার উপর সতরঞ্চি। কেমন দোল খেতে-খেতে যাওয়া। ট্রেনের জানালা কি বাসের জানালা দিয়ে তো বাইরেটা ঠিকঠাক ছোঁওয়া যায় না। কিন্তু গরুর গাড়ীতে চড়ে? আঃ নির্ভয়ে যেন হাত রাখা যায় গাছের ডালে, ঝুলন্ত লতায়, উঁচুপাড়ের ঘাসে।

গরুর গাড়ীতে বাবা, কাকিমা, কাকাবাবুর সঙ্গে বসে থাকতে থাকতে একটাও কথা বলে নি শুক। দেখছিল পাখির ঝাঁক উড়ে যাওয়া, গরুর পাল, খালখন্দ, রুক্ষ মাটি, গাছ-গাছালির ভিতর দিয়ে মাটির ঘর, দূরের অদূরের গাঁ।

কাকীমা তখনই হাসতে হাসতে বলেছিলেন, কি রে শুক, কথা বলছিস না যে!

কাকাবাবু বলেছিলেন, দেখছ না, শুক চোখ বড় বড় করে মুগ্ধ হয়ে আমাদের গাঁ দেখছে!

কাকাবাবু শুকের নিজের কাকা নন। পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন, বাবার সঙ্গে এক অফিসে এক ডিপার্টমেন্টেই চাকরী করেন। ওঁদের কোন ছেলেমেয়ে নেই। তাই শুক আর শান্তাকে ওঁরা ভীষণ ভালবাসেন। শুককে তো একটা ক্যারাম বোর্ড কিনে দিয়েছেন। শান্তাকে অন্যান্য খেলনা দিয়েছেন।

হ্যাঁ, কাকাবাবুদের গ্রাম সোনাচর। এখানে কাকাবাবুদের জমি-জায়গা আছে। দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন আছে। বাড়ী-বাগান আছে। বছর বছর কাকাবাবু এসে ধানচাল আদায় করে যান। দেখা-শোনা করার জন্যে একটা লোক আছে। তার নাম শম্ভু। শম্ভু বাগদী।

এ সব শুকের কাকীমার কাছ থেকে শোনা। সোনাচরের অনেক গল্পই কাকীমা বলেছেন।

তোমাদের গাঁয়ের নাম সোনাচর কেন কাকীমা? সোনা পাওয়া যায় বুঝি! —শান্তা জিজ্ঞাসা করেছিল।

আসলে রাগে শান্তার ওই প্রশ্ন। নইলে হাতীবাগানে হাতী কি বাগবাজারে যে বাঘ পাওয়া যায় না তা কি আর শান্তা জানে না? কিন্তু ওই যে ওকে নিয়ে যাওয়া হবে না—সেই রাগে। আবার বলেছিল, 'দাদার পকেটে চাট্টি সোনা ভরে দিও।' শুক রাগ করেনি। মুখ টিপে হেসেছিল। শান্তা তো বড্ড বোকা। ক্লাস থ্রিতে পড়ে। পড়লে হবে কি, মা যখনই বললেন, 'শান্তু, তুমি চলে গেলে আমি একলা কি করে থাকব?,' তখনই ফস্ করে শান্তা বলে বসল, 'ইস তোমাকে ছেড়ে আমি অমন বিশ্রী জায়গায় যাবই না!' বাবার তো শুককেই নিয়ে আসার ইচ্ছে ছিল না। কাকীমার জন্যেই তার আসা হয়েছে।

বাবা বলেছিলেন, কমল, শুককে নিয়ে যাচ্ছ বটে, কিন্তু এ ব্যাপারে ছোট ছেলে নিয়ে যাওয়া—

ঠিক হবে না —কাকাবাবু বলেছিলেন, কথাটা ঠিক। কিন্তু কি জান, শুক গেলে আমাদের লাভই হবে।

—কেন?

বারে, প্রতিমা আমাদের কাজে বাগড়া দিতে পারবে না। তুমি তো জান, ওর এই ব্যাপারটায় একটা ভীষণ ভয় আছে। ওর ইচ্ছে নয় আমি কাজটা করি। ও বারবার মানা করছে। আর আমি তো আজ থেকে নয়, বেশ কবছর ধরেই নানা সূত্র জোগাড় করে মূল জায়গাটা আবিষ্কারের চেষ্টা করছি। ওর ধারণা, এতে বিপদ ডেকে আনা হবে। জান, তার জন্যেই ও আমাকে সোনাচর যেতে দেয় না। তাইত তোমাকে নিয়ে চলেছি। অবশ্য তুমিও ঢের সাহায্য করবে আমাকে। প্রতিমা জানে তোমাকে আমার গ্রাম দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি। —কাকাবাবু হাঃ হাঃ করে হেসেছিলেন।

বাবা বলেছিলেন, সত্যি বিপদ হবে না তো?

—আমি আছি। কোন ভয় নেই তোমার।

কি জানি। —বাবা চিন্তান্বিত গলায় বলেছিলেন, নিজের জন্যে ভাবছি না। ছোট ছেলেটা রয়েছে।

—শুককে নিয়ে যাওয়াতে বাধা দিও না। তাহলে যাওয়া না যাওয়া সমান হবে। আর প্রতিমারও খুব ইচ্ছে শুককে নিয়ে যাওয়ার।

বাবা আর কথা বলেন নি।

শুক আড়াল থেকে এ সব কথা শুনেছে। নতুন জায়গার লোভের সঙ্গে আর একটা গন্ধ তখনই সে পেয়েছে। অবশ্য সব ব্যাপারটাই তার কাছে ধোঁয়া। কী বিপদ, কী আবিষ্কার— কিছুই কল্পনা করতে পারেনি।

তবে বাস থেকে নামার পর গরুর গাড়িতে যেতে যেতে ওই গন্ধ তার নাকে লাগেনি, চোখের সামনে ওই ধোঁয়াও নেই। তখন মনোরম প্রকৃতির অপার মুগ্ধতায় সে ডুবে আছে।

কাকাবাবুর কথায় লজ্জা পেয়ে সে মুখ সরিয়ে নিয়েছিল।

কাকীমা বলেছিলেন, শুক এবার স্কুল ম্যাগাজিনে 'বীরভূমের গাঁ' নামে একটা রচনা লিখবে বলে বোধ হয় দেখে রাখছে। তাই না শুক?

শুক আরও লজ্জা পেয়েছিল। গতবার স্কুল ম্যাগাজিনে সে 'শরৎ' নামে একটা ছোট্ট কবিতা লিখেছে। না, প্রশংসা করেছে সবাই। কাকীমা তখনই বলেছিলেন, তুই কবিতা লেখ্ শুক। খুব ভাল হাত তোর।

গরুর গাড়িতে বসে কাকীমার কথা শুনে লজ্জা পেয়েও সে উৎসাহিত হয়েছিল। হ্যাঁ, ফিরে গিয়েই লিখবে।

কাকাবাবুদের বাড়ীখানা একতলা। তবে অনেকগুলো ঘর। চারিদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা বাড়ীখানা পেল্লায়। খুবই পুরোন বাড়ী। অযত্ন-অবহেলার চিহ্ন চতুর্দিকে। সামনে ঝোপঝাপ বাগান, দুটো আমগাছ, পেঁপে গাছ গোটা দশেক, গাছভর্তি পেঁপে, আর একটা জাম গাছ।

লাউয়ের লতাও মাচানের উপর। দেওয়ালের গায়ে শ্যাওলা জমেছে, বট অশ্বত্থের চারা গজিয়েছে। বর্ণ তো বোঝার উপায় নেই। বোধ হয়, সাদা রঙই ছিল। ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে সামনে একচিলতে উঠোন বের করা হয়েছে।

কাকাবাবু আসবেন শুনেই শম্ভুদা এ সব করেছে। ঘরগুলোও পরিষ্কার করে রেখেছে। ভেতরে অবশ্য দীর্ঘ দিন রুদ্ধ হয়ে থাকার একটা চাপা ভ্যাপসানো গন্ধ মরেনি।

বাড়ীখানা যে বেশ কিছুকাল যাবৎ অব্যবহৃত, তা এক পলকেই বোঝা যায়। শুক কাকীমার কাছেই অবশ্য সব শুনেছে। সোনাচরের বাড়ীখানা তৈরি করেছিলেন কাকাবাবুর ঠাকুরদা। তিনি বাস করে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ছেলের বাস করার সৌভাগ্য হয়নি। বিহারে কালেকটারীতে চাকরী করতেন কাকাবাবুর বাবা গাঁয়ে আসতেন মাঝেমধ্যে। চাকরী থেকে রিটায়ার করার পর নিশ্চয়ই বাস করতেন। কিন্তু তা আর ভাগ্যে জোটেনি। বিহারেই মারা যান চাকরী করতে করতে। কাকাবাবুর মা ছেলে নিয়ে ওঠেন বাপের বাড়ীতে। সেইখানেই কাকাবাবু মানুষ হন। তবে সোনাচরের সঙ্গে সম্পর্ক বরাবরই রেখেছেন।

এই খোলামেলা বিরাট বাড়ীখানায় শম্ভুদা একলা থাকে, ভাবতেই শুকের গা ছমছম করে উঠেছে। অবাক চোখে সে দেখেছে মানুষটাকে। রোগা মানুষ। বয়স হয়েছে। কোমরে ময়লা কাপড়, খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, মাথার চুল রুক্ষ। বাড়ি খানার চেহারার সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে যায়।

কিন্তু অমন চেহারা হলে হবে কি, মানুষটা কিন্তু ভীষণ ভাল। শুককে দেখেই যেন ভালবেসে ফেলেছে। বড় বড় দু'টো পেয়ারা নিয়ে কাছে ডেকেছে, ও খুকাবাবু, ইধারে এস।

শুক নিতে চায় নি, ঘাড় নেড়েছিল।

কাকীমা দেখতে পেয়ে বলেছেন, নিয়ে নাও শুক। শম্ভুদা দিচ্ছে। ও ত আমাদের ঘরের মানুষ!

শুক নিয়েছিল কাকীমা চলে যেতে শম্ভুদাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি এ বাড়ীতে একলা থাক?

—হ্যাঁ।

—রাত্রিবেলায়?

হি হি করে হেসেছিল শম্ভুদা—বলছ কী খুকাবাবু, রেতের বিলা কুথা বাব?

—তোমার ভয় করে না?

—অয়, আমার আবার ডর কাকে? ভূতপেত আমার কাছে আসবেক নাই!

—ভূত আছে নাকি?

শম্ভুদার সে কী হাসি! থামতেই চায় না। শুক লজ্জা পেয়েছিল।

অথচ গরুর গাড়ী থেকে নামার পর এই শম্ভুদারই কী কান্না! অত বড় মানুষটা যে কাঁদতে পারে ভাবা যায় না। কাকীমার কাছে শুনে তার মনে হয়েছে কাঁদাটা অস্বাভাবিক নয়। একলা মানুষ, পৃথিবীতে আর কেউ নেই ছেলে ছিল। কয়লা খাদে কাজ করতে গিয়ে আর ফেরেনি।

কাকাবাবু বলেছিলেন, কেঁদো না শম্ভুদা, কী করবে— কপাল!

বাবু, নিজের কপালের লেগে কাঁদছি না।—কান্নাভেজা স্বরে শম্ভুদা বলেছিল, আপনারা এসেছেন কতদিন বাদে, তার লেগে কাঁদছি। সেই আনন্দে কাঁদছি। আপনারা ছাড়া ত কেউ নাই আমার! যে কদিন থাকবেন ঘর আলা হয়ে থাকবে!

—আসতে তো চাই শম্ভুদা, কিন্তু কাজের জন্যে আসতে পারি না। তা আছ কেমন?

—দেখছেন তো, বেঁচে আছি খালি! মাঝে জ্বর হনছিল! কিন্তু মরলাম নাই।

কাকীমা বলেছিলেন, ছিঃ শম্ভুদা, অমন কথা বলতে নেই।

শম্ভুদা ছোট্ট ছেলের মত মাথা নীচু করেছিল, প্রতিবাদ করেনি।

শম্ভুদার সঙ্গে কথা বলে শুকের একটা ব্যাপারে কৌতূহল হয়েছিল। অবশ্য কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আরও অনেক মানুষ এল-গেল। তাদের অনেকেরই কথায় বেশ টান। শব্দও অনেক অচেনা। কাকীমাকেই জিজ্ঞাসা করল শুক।

কাকীমা বললেন, হ্যাঁ, বাংলা কথাই, তবে আঞ্চলিক টান আছে। ভিন্ন ভিন্ন জেলার ভিন্ন ভিন্ন টান। ভূগোলে তো পড়েছ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার

কথা। সব জায়গাতেই বাংলা। এই ধর না আগেকার পূর্ববঙ্গ মানে এখনকার বাংলাদেশের কথা। কেমন টান কেমন ভাষা, কিন্তু বাংলাই তো। এই বীরভূমে দেখছ এমনি, মেদিনীপুর কি বাঁকুড়া যাও। দেখবে গাঁয়ের মানুষের কথায় একটা আলাদা সুর। অনেক কিছু জিনিস-পত্রের নামেও তফাত। যেমন ধর, এখানে কুমড়োকে বলে ডিংলে, লঙ্কাকে অনেকে বলে সোপরে, ঘরের সামনে ওই যে রাস্তা, ওটাকে বলে কুলি!

শুক উৎসাহিত হয়ে বলে, আর কাকে কী বলে কাকীমা?

—অত কি আর বলতে পারি? আমি তো বর্ধমানের মানুষ। সব জানি না।

—আচ্ছা কাকীমা, খাতায় লিখে নিলে হয় না?

—লেখ্ না। শম্ভুদার সঙ্গে তো বেশ ভাব হয়েছে। খাতা ভর্তি হয়ে যাবে।

লিখে আমি ক্লাসের ছেলেদের অবাক করে দেব!—শুক বড় বড় চোখে তাকাল।

বললেও লেখা সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করা হচ্ছে না। কিন্তু শম্ভুদার সঙ্গে গল্প করতে ভারী মজা লাগছে।

॥ দুই ॥

এখানে আসার পর কাকাবাবুর সঙ্গে যারা দেখা করতে এল তাদের মধ্যে দুটি মানুষকে শুকের মনে ধরেছে। কাকাবাবু কিন্তু দুটি মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন একেবারে বিপরীত। অন্যান্য গাঁয়ের মানুষদের সঙ্গে নেহাতই সৌজন্যমূলক ব্যবহার, সামান্য হাসি, খবরের আদান-প্রদান।

একজন হলেন মাস্টার মশাই। অতি বৃদ্ধ মানুষ। টক-টকে ফরসা গায়ের রঙ। বয়সের ভারে কেমন যেন নুব্জ, গায়ের চামড়া শ্লথ। কিন্তু এককালে এ মানুষটি যে সুন্দর স্বাস্থ্যের আর চমৎকার রূপের অধিকারী ছিলেন তা অনায়াসে অনুমান করা যায়। মাথার চুল একেবারে সাদা। পায়ে মোজা আর ক্যাম্বিসের জুতো। গায়ে ধুতি-পাঞ্জাবি। হাতে একখানা চকচকে সুন্দর লাঠি। চোখে হাইপাওয়ারের চশমা।

মানুষটা আসতেই কাকাবাবু দাওয়া থেকে নেমে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন— আসুন জেঠু, আসুন!

—ধর বাবা আমাকে একটু, চশমাতেও আজকাল দেখি না।

কাকাবাবু ছুটে গিয়ে হাত ধরলেন। বললেন, আপনার কাছে আজই যেতাম। কষ্ট করে কেন এলেন? দেখুন দেখি কত পরিশ্রম হল আপনার!

কষ্ট কি। কষ্ট কিসের আঁ্যা! তোমাদের ঘর আসতে পেরেছি, বুঝলে, সেই আনন্দটা ওই কষ্টের কাছে কিছুই নয়। উঃ কতদিন পর ঢুকলাম! বুঝলে, বৌমার কাছে এসেছি। শুনলাম, বৌমাকে নিয়ে এসেছ তুমি। আহা! আমার স্যাঙাতের ছেলে! বুঝেছ কলেজ হোস্টেলে তোমার বাবাকে আর আমাকে সবাই বলত, কিউ আর ইউ। কিউ থাকলেই ইউ থাকবে।—শব্দ করে হাসলেন মাস্টার মশাই, —দেখদিকিনি, কতবার তোমাকে কথাটা বলেছি, আবার বলে ফেললাম। এ বয়সের দোষ, যাবার নয়। দেখ না, ভেবেছি আগেকার গল্প করব না, কিন্তু ঠিক বেরিয়ে পড়বে।

কাকীমা উঠোনেই প্রণাম করলেন।

মাস্টার মশাই বললেন, বেঁচে থাক মা, বেঁচে থাক!

কাকাবাবু বললেন, আমার এক বন্ধু আর তার ছেলেকে নিয়ে এসেছি জ্যাঠামশাই।

—বেশ করেছ, বেশ করেছ বাবা।

বাবার দিকে তাকিয়ে কাকাবাবু বললেন, ইনি বাবার বন্ধু। গাঁয়ের স্কুলের মাস্টার মশাই ছিলেন। এখন রিটায়ার করেছেন। গাঁয়ে ত আগে হাইস্কুল ছিল না। এঁর জন্যেই হাই স্কুল হয়েছে, এঁর—

কথার মাঝেই মাস্টারমশাই বললেন, আমি কে বাবা? আমি সামান্য গরীব মাস্টার। স্কুল হয়েছে গাঁয়ের মানুষ-দের দয়ায়। বলতে পার, আমি সামান্য ছোটাছুটি করেছি।

বেশ কিছুক্ষণ মাস্টার মশাই থাকলেন। গাঁয়ের গল্প হল। তার মধ্যে অতীতের কথাই বেশী। গাঁয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই-এর গল্পও বাদ গেল না। কাকীমা কলকাতা থেকে আনা সন্দেশ দিলেন।

যাবার সময় মাস্টার মশাই বললেন, বাবা কমলেশ তোমাকে একটা কথা বলব বাবা।

বলুন।—কাকাবাবু সাগ্রহে তাকিয়ে আছেন তাঁর মুখের দিকে।

বুঝলে বাবা, আমার ছোট ছেলে বি. এ. পাশ করে বসে আছে।—নীচু গলায় বললেন, জান তো বসে থাকা মানে কী! নষ্ট—নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! ওর একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

—কাজ!

—হ্যাঁ বাবা।

—আমি চেষ্টা করব জ্যাঠামশাই। কিন্তু কাজের—

—ব্যস, ব্যস! তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। আমি জানি, তুমি চেষ্টা করবে।

সতীশবাবুর সঙ্গে কাকাবাবুর ব্যবহারটা একেবারে বিপরীত। 'এলাম দাদা!' বলে ঘরে এলেন সতীশবাবু। চেহারা সুন্দর। বড় মাথা। ধবধবে ফরসা গায়ের রঙ, গোল মুখ, মাথায় কালো চুল। কাকাবাবুর বয়সীই হবেন। লুঙ্গির মত করে ধুতি পরা। গায়ে সাদা গেঞ্জি। হাতে ঝকঝকে ব্যাণ্ডের কালো ডায়ালের ঘড়ি। পান খেয়ে মুখ টকটকে লাল। পান চিবোন দেখেই বোঝা যায়, পান খাওয়াটা সখ নয়, নেশা।

কাকাবাবু কিন্তু এগিয়ে গিয়ে আপ্যায়ন জানালেন না। শুকনো গলায় বললেন, এস।

সতীশবাবু এসে বসার পর নিজেই উদ্যোগী হয়ে কথা সুরু করলেন। কাকাবাবুর সঙ্গে নয়, কাকীমার সঙ্গে। তাও যা কথা! 'বৌদি, হাওড়া ব্রীজটা আগেকার মত আছে কিনা', 'কলকাতায় কত লোক বেড়েছে', 'নতুন নতুন কত বাড়ী হয়েছে', 'কলকাতার ভেতর নাকি ট্রেন চলবে'—এই সব। তার সঙ্গে হোঃ হোঃ করে হাসি।

শুককেও পাকড়াও করলেন। পিঠ চাপড়ে বললেন, কী নাম তোমার?

—শুকদেব রায়।

—কোন্ ক্লাসে পড়?

—ক্লাস সেভেন।

—বাঃ। কিন্তু বৌদি, হঠাৎ আপনারা এ অসময়ে গাঁয়ে এলেন?

—এমনি বেড়াতে।

—শুধু বেড়াতে?

—আবার কি!

সতীশবাবু মাথা নামিয়ে বললেন, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

সতীশবাবু চলে যাবার পর কাকাবাবু বাবাকে বললেন, এই লোকটা সম্পর্কে সাবধান। ডেঞ্জারাস মানুষ। কোন কিছু ওকে বলবে না। আমাদের জ্ঞাতিশত্রু। ওর বাবা আমাদের সঙ্গে চিরকাল মামলা করে গিয়েছেন।

শুকের খুব খারাপ লাগছিল ব্যাপারটা। ক দিনের জন্য এসেছে। ভেবেছিল, ঘুরবে, বেড়াবে, দেখবে—তা নয়, কী না কী ঝামেলা!

সন্ধেবেলায় শুক ঘরে ঢুকে দেখল, বাবা আর কাকাবাবু ভয়ঙ্কর ব্যস্ত। পলতে বেশ বাড়ান হ্যারিকেন জ্বলছে। সামনে একটা ম্যাপ পাতা। সাধারণ ম্যাপ নয়। মাকড়সার জালের মত অজস্র ঘর। সামনে একটা ডিভাইডার ফেলা। ছোট্ট একটা স্কেল।

কাকাবাবু বললেন, এই যে দেখছ এটাই হল লাটুডাঙ্গাল। এদিকে সোনাচর মৌজা, ওদিকে কুশাইপুর। পুব পশ্চিমে নামজুল মৌজা আর রানীপুর মৌজা। লাটুডাঙ্গালও একটা মৌজা। তবে এই দাগ নম্বরটা ৭২৩। হ্যাঁ, ক্ষেত নয় এটা, তুমি তো দেখলে দিনের বেলায়। ঝোপঝাড় জঙ্গল। আমার বিশ্বাস ওটাই লাটু ডাকাতের মূল আস্তানা ছিল। গাঁয়ের লোক লাটুডাঙ্গাল বলতে ওটাকেই বোঝে।

—কিন্তু আস্তানা না হয় ওটা হল। ডাকাত লাটু যে ওখানেই তার সম্পত্তি পুঁতে রেখেছে তার কি ঠিক আছে? আশেপাশে রাখতে পারে।

আগে আমাদের আস্তানাটা খুঁজতে হবে। সেটাকে কেন্দ্র করেই···—শুককে চোখে পড়তেই কাকাবাবু থেমে গেলেন। তারপর শুধোলেন, কিছু বলবে শুক?

শুক বলল, না, কিছু না।

বাবা বললেন, তুমি তোমার কাকীমার কাছে যাও শুক।

॥ তিন ॥

সোনাচর থেকে পাহাড় দেখা যায়। সত্যিকারের পাহাড়। সোনাচর থেকে কিন্তু চমৎকার ছবির মত মনে হয়। আকাশের ঢালু পাড় থেকে কে বুঝি বিরাট একটা থিয়েটারের সিন টাঙিয়ে রেখেছে। দূরে পশ্চিমের দিগন্তরেখা বরাবর আকাশের সঙ্গে মিশে আছে পাহাড়টা। ওর উপরের গাছগুলোকে ভারী সুন্দর দেখায়। মনে হয়, পাহাড়টার মাথায় খাড়া চুল গজিয়েছে। বিকেলের দিকে আকাশের মতই নীল হয়ে ওঠে পাহাড়টা। তবে একটু ঘননীল। আকাশ পাহাড় আলাদা হয়েই থাকে।

পাহাড়গুলো কত কাছে শম্ভুদা! চল না ঘুরে আসি।—শুক বলেছিল।

শম্ভুদার কী হাসি—খুকাবাবু, বলছ কী তুমি! কাছে! আঁ, উ পাহাড় কাছে!

—কাছে নয়? দূরে?

—নিচ্চয়। এক বিলা হাঁটলে তবে পাহাড়ে যেতে পারবে।

শম্ভুদার কাছেই শুক জানতে পারল, ওই পাহাড়ে পৌঁছোতে গেলে, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না চড়াই উৎরাইয়ের জন্যে, পথে পড়বে বেশ কয়েকটা ক্ষুদে গ্রাম, আমের বাগান, ক্ষুদে বন, ক্ষুদে নদী, খাল, বিশাল সব দীঘি, ধানের ক্ষেতের পর ক্ষেত, উঁচু রুক্ষ মাঠ।

এক বেলা কত আর সময়! শুক ভেবে রেখেছে, কাকীমাকে বলবে, চল না কাকীমা, পাহাড় দেখে আসি।

সোনাচরের কাছেই একটা নদী। অতি শীর্ণা নদী। নাম কুশবর্মা। শুধু সাদা বালি। দুদিকের পাড় নীচু। বর্ষায় নাকি দুকূল ছাপিয়ে ঘোলা জল ছোটে। দুপাশের ক্ষেত ভাসিয়ে দেয়। সোনাচর গাঁয়েও ঢুকে পড়ে। ওই যে কয়েক বিঘৎ দূরে সোনাদহ নামে বিরাট লম্বা দীঘিখানা, ওটাও নাকি নদী হয়ে যায়। তখন এপার-ওপার করা যায় না। কোন ব্রীজ নেই। নদীতে নৌকা চলে না। চলবেই বা কেন, নদী তো কয়েক দিনের জন্যে মাত্র। তার পর সারাটা বছর শুকনো বালি বুকে নিয়ে চিৎপাত পড়ে থাকা। শুধু একটা জলের রেখা তিরতির করে বয়। পাখপাখালি তাতে ঠোঁট ভেজায়।

নদীর তিরতির করে বওয়া জলের উপর পা রেখে শুক তখন চারপাশ দেখছে। বড় ফাঁকা ফাঁকা। তবে যেখানে গাছগাছালি ঝোপঝাড়, সেখানটা জমাট। ওই দূরে মাটির উঁচু সড়ক। দুধারে তার ধানক্ষেত। আর ওই যে ক্ষুদে বনটা, ওখানে শুধু সবুজ শালের গাছ। একলা যেতে ভয় করে। অবশ্য ভয়ের এমন কিছু নেই। বাঘ-ভালুক নেই। তবে সাপ আছে, শিয়াল আছে। আর আছে হাঁড়বাঘা। এখানে সব 'হেঁড়াল' বলে। ছাগল-গরু টেনে নিয়ে যায় হাঁড়বাঘা। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পেলেও তুলে নেয়। রাত্রিতে নাকি গাঁয়ে আসে। তখন কিন্তু কুকুরেরা শব্দ করে না। ওদের গায়ের গন্ধ টের পাওয়ামাত্র লেজ গুটিয়ে লুকিয়ে পড়ে।

এদিকটায় তাল-খেজুরের গাছই বেশী। নিম বট অশ্বত্থ আম জাম অর্জুন শ্যাওড়া বাবলা রয়েছে অজস্র। তাছাড়া আছে পলাশের গাছ। এই প্রথম শুক পলাশ দেখল।

এখানে এসে শুক আর একটা নতুন গাছ দেখল। নামটা শোনার পর থেকে শুক ভেবেছিল, মহুয়া বুঝি ছোট্ট ছিমছাম ফুলের মত কোন গাছ হবে। কোথায় তা, মহুয়া প্রকাণ্ড গাছ। আম জামের মত। মোটা মোটা ডাল। ঢলানে বড় বড় পাতা। চৈত্রমাসে মহুয়ার ফুল হয়। খেতে নাকি খুব সুন্দর।

গাঁয়ের বাইরে ধানক্ষেতের মাঝে মহুয়ার গাছ আছে অনেকগুলো। বন নয়। বড় একটা বাগানের মত। মাঝে আবার হরিতকীর গাছ আছে। এটাও শুক এই প্রথম দেখল।

শম্ভুদা বলেছে, পাকা হরিতকী খেলে রাজা হয়।

শুক বলেছে, তুমি খেয়েছ শম্ভুদা?

খিলখিল করে শরীর দুলিয়ে হেসেছে শম্ভুদা—আঁ খুকাবাবু, আমি রাজা বটি! আমাকে দেখে রাজা মুনে লয়?

শুক কিছু বলতে পারেনি। রাজা হবার এমন সুযোগ থাকতে লোকে যে কেন হয় না!

পাখি আছে এখানে অজস্র। শুক সব পাখি চেনেনা। শম্ভুদাও না। বিকেলবেলায় কাকাবাবুদের ঘরের উঠোনের কুলগাছে ঝাঁক ঝাঁক টিয়ে উড়ে এসে ডানার ঝটপট শব্দ তোলে, ঠোঁটে কত যেন ঝগড়া! তাছাড়া লাল-নীল-হলুদ সবুজ বিচিত্র বর্ণের ঝুঁটিওয়ালা-ঝুঁটিহীন কত যে পাখি আসে! পাশেই বাঁশবন। বিকেল বেলায় রাজ্যের কাকের মেলা বসে। সন্ধ্যে পর্যন্ত তাদের বিতর্ক-সভা। কান পাতা দায় হয়ে ওঠে।

—এই খোকা!

কর্কশ গলায় ডাক শুনেই শুক চমকে উঠল। দ্রুত পিছনে তাকাল।

একটা লোক। কোমরে সবুজ লুঙ্গি, খালি গা, বুকে লোমের অরণ্য। দীঘল শরীর। স্বাস্থ্যেরও অমিত প্রাচুর্য। মনে হয়, ব্যায়াম করে। টাঙ্গি গোঁফ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। মুখখানাতে এবং বড় বড় চোখ দুটোর মধ্যে কোন স্নিগ্ধতা নেই। বরঞ্চ বেশ রুক্ষ এবং কর্কশ। নদীর বালি ফুঁড়েই বুঝি ডাকাতের মত চেহারা নিয়ে মানুষটা উঠে এসেছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে একেবারে শুকের সামনে এসে দাঁড়াল।

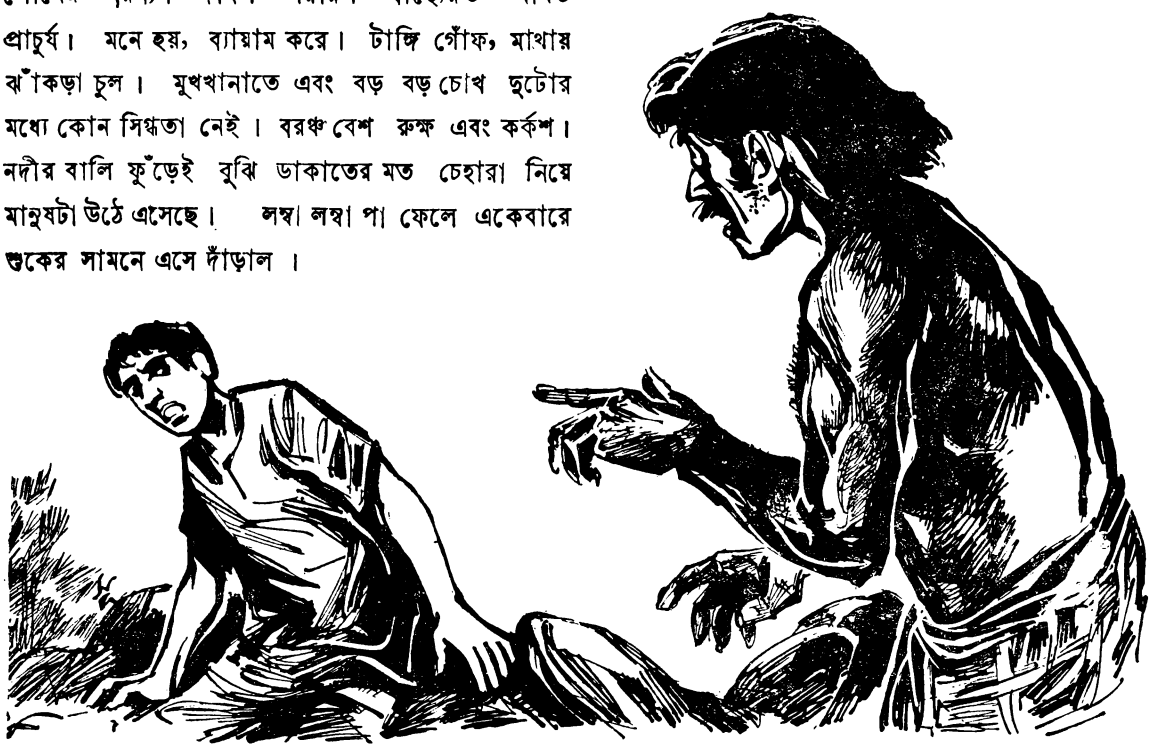

—কী ব্যাপার, সাড়া দিচ্ছ না?

শুক সাহস করেই শব্দ করল— কি বলছেন?

—কোথায় এসেছ?

—বেড়াতে।

—অ!

চেহারা দেখে শুক ভেবেছিল এ অঞ্চলের টানেই কথা বলবে। শুকের অবাক লাগছিল।

—কমলবাবুর বাড়ী এসেছ তুমি?

—হ্যাঁ।

—দেখেই চিনেছি তোমাকে। তোমার বাবাও তো এসেছেন?

শুক ঘাড় নাড়ল।

—কত দিন থাকবে তোমরা?

—জানি না।

—তুমি ছেলে কেমন?

শুক অবাক চোখে তাকাল।

লোকটা হাত নেড়ে বলল, বলি ভাল ছেলে তো!

শুক উত্তর দিল না।

চুপ করে আছ যখন, তখন নিশ্চয়ই ভাল ছেলে!—

লোকটা যেন নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলছে এমন করে বলল। তারপর মুখে ফোটাল মিটমিটে হাসি।

শুক কেমন যেন পাথর হয়ে গেছে।

—তোমার বাবা পুলিসে কাজ করেন?

পুলিসে! —শুক ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, না তো, বাবা অফিসে চাকরী করেন।

—মিথ্যে কথা বলছ! এইটুকু ছেলে, গলা টিপলে এখনও দুধ বেরোয়। জান মিথ্যে বললে কী হয়?

অসম্ভব ভয় পাওয়া পাংশু মুখ, শুকনো ঠোঁট সামান্য নাড়ল শুক।

লোকটা ঝুঁকে বলল, মিথ্যে কথা বললে আমি গলা টিপে তার দুধ বের করি। তবে কিনা সে ছেলে আর বাঁচে না।

হাহা করে হাসল মানুষটা। তার হাসিই বুঝি শুককে সাহসী করল। বলল, আমি মিথ্যা কথা বলিনি।

—তোমার বাবা আর কমলবাবু। কেন এসেছেন? শুধু বেড়াতে? না, অন্য কিছু মতলব আছে? সে মতলবটা কী? যা জান সব পরিষ্কার করে বল আমাকে।

শুক বলল, আমি জানি না।

—নিশ্চয়ই জান। তুমি একেবারে খোকা নও।

—আমরা কাকাবাবুদের বাড়ী বেড়াতে এসেছি, এই জানি।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গেই দাবড়ে উঠল— খবরদার! কিছু গোপন করার চেষ্টা করো না।

শুক অসহিষ্ণু গলায় বলল, বা রে, যা জানি তা বললাম। আর আপনারই বা অত জানার দরকার কী?

মুখ সরেছে খোকাবাবুর!—লোকটার মুখ বিদ্রূপে জ্বলে উঠল। চোখ নাচিয়ে বলল, তাহলে বলে রাখি খোকাবাবু তোমাকে, বেশী ক্ষ্যাপালে এই নদীর বালিতে পুঁতে··· হ্যাঁ।

শুক বলল, আমাকে আর কিছু বলবেন?

—না। আর কিছু না। আর কিছু বলব না। শুধু শেষবার জিজ্ঞাসা করব, তুমি কিছু জান না?

—না।

অল রাইট। —লোকটা মাথা নাচাল। বলল, যদি তোমার কথা সত্যি হয়, তাহলে ছাড়ান। নইলে আর কলকাতায় ফিরতে হবে না। হ্যাঁ, প্রথমে তোমাকেই সরাব।

শুক কোন কথা বলল না। থমথমে মুখে তাকিয়ে রইল।

লোকটা কয়েক পা গিয়েই আবার পিছিয়ে এল। তারপর বলল, তোমাকে যে আমি এসব কথা জিজ্ঞাসা করেছি তা কিন্তু কাউকে বলবে না। কেমন? বললে রেহাই নেই। তুমি ভাবছ লুকিয়ে বলবে। উহুঁ, সে জোও নেই। তোমাদের ঘরে আমাদের কান পাতা আছে খোকাবাবু। কানে উঠলেই আজ রাতেই বিছানা থেকে তুমি লোপাট হয়ে যাবে!

শুক এ কথারও উত্তর দিল না। সে দেখল, লম্বা লম্বা পা ফেলে লোকটা নদী ধরে হাঁটছে। না, সোনাচরের দিকে গেল না। উল্টোদিকে মাটির রাস্তা ধরল। পিছু ধাওয়া করবে নাকি? না, অমন বোকামি সে করবে না। তবে চেহারাখানা সে নিখুঁত করে দেখে নিয়েছে। কপালের পাশে একটা কাটা দাগ আছে। মুখোশ পরে আসেনি। কিন্তু লোকটা কি সোনাচরের? হয়ত! তাকে বুঝতে না দেবার জন্যেই উল্টো পথ ধরল। তারপর ফিরবে। সতীশবাবুর মত এও জানতে চাইল কেন আমরা এসেছি! তাহলে এ নিশ্চয়ই সতীশবাবুর লোক। কাকাবাবু তাই বলেছিলেন, লোকটা সম্পর্কে সাবধান।

না, লোকটা তাকে বিছানা থেকে লোপাট করবে সে ভয় পায় না শুক। কাকাবাবু কাকীমা বাবা—তিনজনকেই সে বলতে পারে। কিন্তু বললে তাকে বোধহয় আর বেরুতে দেবে না। বরঞ্চ এখন থাক। সে চেপে থাকুক। সময় বুঝে প্রকাশ করবে।

বেলা পড়ে আসছে। আর থাকা যায় না। কিন্তু লোকটা যে বলল তাদের ঘরে কান পাতা আছে! কান পাতা আছে বলে শুধু তাকে ভয় দেখাল নাকি? নাকি সত্যি সত্যিই আছে! কে সে! ঘরে সব সময় মানুষ বলতে তো শম্ভুদা। শম্ভুদা ওদের লোক হতেই পারে না।

কিন্তু সতীশবাবু কেন জানতে চাইছেন? কাকাবাবু লাটুডাকাতের আস্তানা খুঁজলে সতীশবাবুর কী যায় আসে? শুক ভাবতে পারছে না। মাথার ভিতর সব পোকার মত কিলবিল করছে।

॥ চার ॥

লাটুডাঙ্গাল, তার পরই লাটুডাকাতের কথা বলতে শম্ভুদা যেন শুকের মুখ থেকে লুফে নিল কথাটা। বলল,

ও, লাটুডাকাতের কথা বলছ! উর কথা জানব নাই? আমার মা কত গল্প বলেছেক।

শম্ভুদা যা বলল, তা হল এই: অনেক—অনেক বছর আগে লাটু নামে এক ডাকাত ছিল। দুর্দান্ত ডাকাত। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কানে দুল, বিরাট গোঁফ। আর শরীরখানাও ছিল অমানুষিক। দেখলেই মানুষ ভয় পেত। রনপায়ে মাইলের পর মাইল ছুটত। রনপায়ে উঠলে মানুষ নয়, ওকে তখন ছোটখাট একটা দৈত্য মনে হত। গলার স্বরও ছিল অস্বাভাবিক। হুঙ্কার দিলে নাকি গোটা গাঁয়ের লোক থরথর করে কাঁপত। তখন চারিদিকে বন জঙ্গল। বাঘ-ভালুকও ছিল। তা লাটু-ডাকাতকে দেখলে নাকি বাঘ-ভালুকও লেজ গুটিয়ে নেড়ী কুকুরের মত পালাত। একবার লাঠির এক ঘায়ে একটা বাঘ নাকি মেরেছিল। ওর দলও ছিল বিরাট। আর লুকিয়ে-চুরিয়ে আসত না ডাকাতি করতে। আগে চিঠি দিত, 'আজ আপনার বাড়িতে যাচ্ছি। অভ্যর্থনার আয়োজন করবেন। ইতি লাটু।' চিঠি পেয়ে পুলিস-দারোগাকে খবর দেবার সাহস কারও ছিল না। একবার এক জমিদার নাকি খবর দিয়েছিল। তখন ইংরেজ রাজত্ব। আর দারোগাও ছিল থানায় জোরদার—লাটুডাকাতকে ধরবেই! থানার সব পুলিস নিয়ে দারোগা সাহেব তো হাজির। অমাবস্যার ঘুটেঘুটে অন্ধকার রাত্রি। সবাই অপেক্ষা করছে। একটু শব্দ হলেই চমকে উঠছে সব। কিন্তু লাটু-ডাকাত আর আসে না। অবশ্য তখন সন্ধ্যে রাত। সবাই ভেবেছে মাঝরাত হোক। ডাকাতি করতে কি সন্ধ্যে রাতে আসে! এমন সময় হৈ হৈ চিৎকার—আগুন লেগেছে! আগুন লেগেছে! হ্যাঁ, জমিদারদের পাড়াতেই আগুন। দাউ দাউ করে জ্বলছে একটা খড়ের ঘরের চাল। তখন তো আর দালান কোঠা নেই, সব খড়ের চাল। লাটু-ডাকাত আসবে শুনে গাঁয়ের লোকেরা তো খিল এঁটে শুয়েছিল। তারাও বেরিয়ে পড়ল। পুলিসদলও বেরুল। এক ঘর থেকে আর এক ঘর, তারপর গোটা গাঁ আগুন গ্রাস করে ফেলবে। মানুষ হয়ে তো বসে থাকা যায় না। জমিদার অবশ্য হাই হাই করতে থাকল। কিন্তু তার কথা কে শোনে! 'জল আন, জল আন!' শব্দ করে সবাই আগুন নেভাতে ছুটল। তারপর আগুন নেবানোর পর সবাই যখন ফিরে এল, তখন দেখল, জমিদারের মৃতদেহ উপুড় হয়ে পড়ে। পিঠে একটা তীক্ষ্ণ ছোরা বসান। ব্যস, তারপর আর কোন জমিদার পুলিসকে খবর পাঠাতে সাহস করে নি।

সন্ধ্যেবেলায় শুক লটুডাকাত আর তার সম্পত্তি সম্পর্কে আরও অনেক কিছু নতুন তথ্য জানতে পারল। কাকীমা গিয়েছেন ওই মাস্টার মশাইয়ের বাড়ী। ওখানেই আজ নিমন্ত্রণ। ঘরে বাবা আর কাকাবাবু। দুখানা চেয়ার নিয়ে তাঁরা বারান্দায় বসে আছেন। শুক হ্যারিকেন নিয়ে ঘরের ভিতর একটা পুরোনো বই দেখছে—অনেক কাল আগের একটা পত্রিকা। ছোটদের বিভাগে একটা জাতকের গল্পে সে চোখ লাগিয়েছে। এমন সময় তার কানে গেল বাইরে বারান্দার কথাবার্তা।

কমল, ঠিক জায়গা যদি না বার করতে পার, তবে কিন্তু স্রেফ পণ্ডশ্রম হবে।—বাবা বললেন, আচ্ছা লাটু-ডাঙ্গালের সবটাই তো তোমাদের?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, সবটাই। গোটা মৌজাটা না হলেও বিশেষ করে যে জায়গাটাকে লোকে লাটুডাঙ্গাল বলে সেটা আমাদের নিজেদের। আমার ঠাকুরদাই কিনেছিলেন। আর তাঁর লেখা পড়েই তো আমার উৎসাহ। বছর তিনেক আগে আলমারি ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা খাতা পাই। বিবর্ণ খাতা। লেখাও ফ্যাকাশে। কোনক্রমে পড়েছি। মুরমুরে হয়ে গিয়েছে পাতা। লেখাটার নাম 'লাটুডাকাতের কথা'। আমার মনে হয়, আমার ঠাকুরদা কোন পত্রিকায় ওটা পাঠাতে চেয়েছিলেন প্রকাশ করার জন্যে। কিংবা নেহাতই শখ করে লেখা। তবে নেহাত গালগল্প নয়। ওতে গাঁয়ের আশেপাশের নানা লোকের নাম নাম আছে। তার মানে উনি তথ্য জোগাড় করেছেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি তো আমাকে ওসব কথা বলেছ অনেক-বার। কিন্তু আমি বলছি ওর গুপ্তধনের কথা। তোমার খাতায় ডাকাত লাটুর গুপ্তধনের কোন ইঙ্গিত আছে?

আছে বৈকি!—কাকাবাবু বললেন, আর তা বলেওছি তোমাকে। ওতে পরিষ্কার লেখা আছে। হ্যাঁ, ভাষাটা একটু অন্য রকম হয়ে যাবে, আমার তো মুখস্থ নেই। ওতে লেখাই আছে, ডাকাত লাটু পুলিসের হাতে ধরা পড়েনি,

যদিও ওর মস্তকের দাম সরকার বাহাদুর হাজার টাকা ধার্য করেছিলেন। হ্যাঁ, সরকার মস্তক কেন, মৃতদেহটাই পেয়েছিল। শুধু ওর নয়, গোটা একটা দলের। এক জায়গায় বিয়ে বাড়িতে ডাকাতি করতে যায় লাটু। জমিদারের মেয়ের বিয়ে। না, কোন বাধাই লাটু পায়নি। টাকাকড়ি সোনাদানা নিয়ে নির্বিঘ্নে তার দল বেরিয়ে যেতে পেরেছিল। সঙ্গে অবশ্য জমিদারের বাইরের ঘরে রাখা রসগোল্লার একটা বিরাট গামলাও নিয়ে যায়। জমিদারই ওটা দেন পথে খাবার জন্যে। আর ওই রসগোল্লাই কাল হয়। চতুর জমিদার ওই রসগোল্লায় মারাত্মক বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলেন। জমিদারের গাঁয়ের বাইরে ডাকাত লাটুর দল রসগোল্লা খায়। কিন্তু কাউকেই দু মাইলের বেশী যেতে হয়নি। পরের দিনই এখানে সেখানে সব কটা ডাকাতের মৃতদেহ পড়ে ছিল। বুঝতে পারছ তাহলে, পুলিস যে ধরে লাটুর কাছ থেকে তার জমানো সম্পত্তি বার করবে কি দলের লোক কেউ লাটু মরবার পর সেটা তুলে নেবে, তা আর ঘটেনি। লাটুর লুণ্ঠন করা সম্পদ সম্পূর্ণ অন্ধকারেই থেকে গিয়েছে। আর তা থেকেছে ওর আস্তানারই ধারে পাশে।

কাকবাবু বলে চললেন, গুপ্তধনের ভাণ্ডারটা হাতে এলে কোন ভাবনা নেই। হোক শহর দূরে। তবু ওখান থেকেই ইলেকট্রিসিটি টেনে আনব। টাকা থাকলে ভাবনা কি! বোঝ, একটা ডাকাত সারাজীবনে কম লুটপাট করেনি। মুদ্রা হয়ত বিশেষ কিছু পাব না। কিন্তু সোনা! আমার বিশ্বাস, কোটি কোটি টাকার সোনা হাতে আসবে।

বাবা বললেন, ওই দেখ, হ্যারিকেন হাতে কে আসছে।

শুক বাইরে বারান্দায় এসে এতক্ষণে দাঁড়াল। অন্ধকারে হ্যারিকেন হাতে একটা মানুষ এসে দাঁড়াল। তারপর বলল, মাস্টার মশাইয়ের বাড়িতে চলুন।

বাবা বললেন, এর মধ্যে!

কাকাবাবু বললেন, এখানে সন্ধ্যের পরই রাত্রির খাওয়া সারা। নটা-দশটা পর্যন্ত খুব কম মানুষ জেগে থাকে। তাছাড়া শুক রয়েছে, ছোট ছেলে, তাই ডেকে পাঠিয়েছে।

লোকটার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে তুমি যাও। আমরা যাচ্ছি।

॥ পাঁচ ॥

শুক গাঁ দেখতে বেরিয়েছিল সকালেই। না বাইরে নয়, গাঁয়ের এ পাড়া ও পাড়া। ছোট গাঁ। তিন দিকে তিনটে পাড়া। বেশীর ভাগই মাটির ঘর। মাত্র তিনখানা টিনের চাল, দুটো দালান কোঠা। গাঁয়ের লোক বেশ কৌতূহলে তাকে দেখছিল। কেউ অবশ্য কোন কথা বলেনি, কিছু জিজ্ঞাসাও করেনি। তার বয়সী দু-একটা ছেলেকে সে দেখল। কিন্তু কথা বলল না। কেমন যেন লজ্জা লাগল।

বাড়ীতে ফিরে শুক দেখল, সতীশবাবু এসেছেন। সেই এক সজ্জা। ঠোঁটে পানের টকটকে রঙ। মুখ নড়ছে, সেইসঙ্গে চলছে কথা। বাবা কি কাকাবাবুকে দেখতে পেল না। বোধ হয় বাইরে বেরিয়েছেন।

শুক বারান্দায় উঠতেই সতীশবাবু বললেন, ছেলেটা বেশ সাহসী।

কাকীমা হাসলেন—কেন?

—কলকাতার ছেলে। কিন্তু একা একা কেমন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ও।—কাকীমা বললেন, গাঁয়ে আবার ভয় কি? কেন বেড়াবে না? জান ঠাকুরপো, শুকের না আমাদের গাঁটা ভারী ভাল লেগেছে। ও আবার ফিরে গিয়ে স্কুল ম্যাগাজিনে আমাদের গাঁয়ের কথা লিখবে। কেমন বেড়ালো কী দেখল, এই সব।

—বাঃ। লেখা টেখা করে তাহলে! গুণ আছে দেখছি। ক্ষুদে কবি তাহলে আমাদের শুকদেব।

শুক বারান্দায় দাঁড়াল না। ঘরের ভিতর ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য বেরিয়ে গেল। সতীশবাবু আছেন জানলে সে আরও ঘুরে বেড়াত।

সতীশবাবু অবশ্য তার কথা বললেন না। পান চিবুতে চিবুতে বললেন, তাহলে বৌদি, আপনারা বেশ কিছুদিন এখানে থাকবেন বলে এসেছেন?

কাকীমার মুখে হাসির বদলে এবার বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল। বললেন, আমার ভাই একটুও থাকার ইচ্ছে নেই। এখনই যেতে পারলে বাঁচি। তোমার দাদার জন্যে যেতে পারছি না।

সতীশবাবু যেন লুফে নিলেন কথাটা—কেন? দাদা থাকতে চাইছেন কেন?

—আর কেন! বলছেন, 'এলাম আর যাব তা কী হয়? দুদিন ছুটি উপভোগ কর।'

—কথাটা ঠিক। তবে কি জানেন যা জায়গা এটা, একে ছুটি উপভোগের জায়গা বলে না। কলকাতার মতই জিনিসপত্রের দাম। বেশী বরঞ্চ বলতে পারেন। ডাক্তার নেই। হঠাৎ অসুখে পড়লে ভগবানের উপর শুধু নির্ভর করে থাকতে হবে।

কাকীমা যেন ভয় পেলেন কথাটা শুনে। অর্থাৎ অসুখের কথায়। বললেন, আর ঠাকুরপো অসুখবিসুখের নাম করো না, কলকাতায় যেতে পারলে বেঁচে যাই ভাই!

সতীশবাবু হাসলেন—আপনি ভয় পাচ্ছেন বৌদি।

—পাচ্ছি বৈ কি ঠাকুরপো।

কি সাহসী ছেলে, কাকীমার ভয় কাটাতে পারছ না? —সতীশবাবু শুকের দিকে চেয়ে চোখ নাচালেন।

শুককে বারবার সাহসী ছেলে বলছেন কেন সতীশবাবু শুক? অবাক চোখে তাকাল। তাহলে কি নদীর ধারে লোকটাকে সতীশবাবুই পাঠিয়েছিলেন? সে-ই সব কথা বলেছে এঁকে?

কাকীমা বললেন, জান ঠাকরপো, তাও যদি তোমার দাদা বাইরে নিয়ে যেত বেড়াতে।

সতীশবাবু কাকীমার সুরে সুর মেলালেন—তা ত বটেই। ঘরে বসে থাকতে কি ভাল লাগে! এসেছেন বেড়াতে। তা বেড়াবার জায়গার তো এখানে অভাব নেই। সামনেই বক্রেশ্বর রয়েছে। আপনি অবশ্য গিয়েছেন, তবু আবার যেতে দোষ কী? এখন খুব সুন্দর করে সাজান হয়েছে বক্রেশ্বর—হট স্প্রিং, স্নানের জায়গা, মন্দির ঝকঝকে করে তোলা হয়েছে। তা যদি না যান তাহলে ম্যাসাঞ্জোর যান। আপনি ম্যাসাঞ্জোরে গিয়েছেন? যান নি। পাহাড় দিয়ে ঘেরা বিরাট জলাশয়। ময়ূরাক্ষী নদীকে বাঁধা হয়েছে। তা থেকে বিদ্যুত, তারপর ক্যানেলে জল পাঠান হচ্ছে চাষের জন্যে। হ্যাঁ, দেখার মত জিনিস বটে। তারপর ধরুন, বাসের সুযোগ হয়েছে এখন। বেশী ঝামেলা নেই। জয়দেবের কেন্দুবিল্ব থেকে বেড়িয়ে আসতে পারেন। তারাপীঠ যাবার বাসও হয়েছে। আসলে ইচ্ছে থাকলেই সব হয়।

—যা বলেছ! দাঁড়াও না আজ তোমার দাদা আসুন। উনি বলেন যাতায়াতের খুবই অসুবিধা।

সতীশবাবু শব্দ করে হাসলেন—আপনাকে ভয় দেখিয়েছেন। এখনকার দিনে যাতায়াতের কোন অসুবিধা নেই।

সন্ধ্যেবেলায় কাকীমার সঙ্গে কাকাবাবুর তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল। বোধ করি কাকীমা যে রাগ-রাগ মুখ ভারী করে কাটাচ্ছিলেন তা সতীশবাবুর কথার ফলেই এমন করে বিস্ফোরিত হল। তিনি বলে বসলেন, আর এখানে একদণ্ড নয়। দেখা হল গাঁ। কলকাতা ফিরে চল।

তার সঙ্গে তিনি তাঁর অনুযোগটাও জুড়তে ছাড়লেন না। সেটা হল, কাকাবাবুকে ভূতে ধরেছে। এই ভূত তাদের সংসারে সর্বনাশ ডেকে আনবে। কিছু একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড না ঘটলে কাকাবাবু থামবেন না। ইত্যাদি।

কাকাবাবু অবশ্য ঠাণ্ডা হয়েই শুনছিলেন প্রথমে। এবং কাকীমাকে বোঝাতেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু পারলেন না। তখন বললেন, তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি ফিরে যাও। আমি যাব না।

বাবা ঝগড়াটা থামাতে চেষ্টা করলেন। থামল না। কাকীমা তখন কাঁদতে বসলেন। কান্নার সঙ্গে অবশ্য তিনি যা বললেন, তা হল কাল সকালেই তিনি যাবেন। আর ওটা যে সত্যি তা বোঝাবার জন্যেই তিনি ডাকলেন, শম্ভুদা!

শম্ভুদা চুপচাপ ঝগড়া শুনছিল। বলল, কী মা?

—কাল সকালে একটা গরুর গাড়ী ঠিক কর।

শম্ভুদা উত্তর না দিয়ে কাকাবাবুর মুখ দেখল।

কাকীমা বললেন, কী, কথা বলছ না যে! তুমি পারবে না বুঝি? না পার তো বল, আমি নিজেই বেরুব। গরুর গাড়ি না পাই, হেঁটেই যাব।

শম্ভুদা বলল, কী যে বলেন মা!

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার সময় অবশ্য মিটমাট হল

কিছুটা। কাকীমার জেদের জন্যেই বুঝি কাকাবাবু পরাজয়টা মেনে নিলেন। বললেন, কালই আমরা মইষেবুড়ী বনে বেড়াতে যাব।

কাকীমা উত্তর দিলেন না।

॥ ছয় ॥

পরের দিন মইষেবুড়ী বনে যাওয়া হল।

সোনাচর থেকে মইষেবুড়ীর বন ক্রোশ দেড়েক পথ। মাঝে কোন গ্রাম পড়ে না। ফাঁকা রুক্ষ ডাঙ্গা। মধ্যে মধ্যে মহুয়ার গাছ আর ধানক্ষেত, শূন্য কাঁকুড়ে রুক্ষ প্রান্তরও আছে। বাঁ পাশে কেবল একটা সাঁওতাল পাড়া। ঝোপের ভিতর দিয়ে মাটির ঘরের রঙ করা দেওয়াল চমৎকার দেখাচ্ছিল।

মা মইষেবুড়ীর কথা শুক শম্ভুদার মুখে শুনেছে। ভীষণ জাগ্রত দেবী। উনি নাকি রাত্রিবেলায় ঘোড়ার পিঠে চড়ে সারাটা বন ঘুরে ঘুরে বেড়ান। বনে রাত্রিতে কেউ থাকতে পারে না। কোন প্রাণীও নাকি তখন থাকে না। একজন জেদী মানুষ, কবে সেই কোন্ কালে যেন, থাকতে গিয়েছিল রাত্রিবেলা ওখানে। পরদিন তার ফল দেখা যায়। মানুষটা পাগল হয়ে যায়।

শম্ভুদা বলে দিয়েছে, ঠাকুরথানের পাতা ছিঁড়তে নেই। ঠাকুর তাহলে রাগ করে।

মইষেবুড়ী বনটা ভারী সুন্দর। পরিষ্কার ছোট্ট বন। মখমলের মত ঘাস। দৈর্ঘ্যে এক মাইল, প্রস্থে আধ মাইলেরও কম। বড় গাছ বলতে তো কেবল মইষে-বুড়ীর মাটির উপর উঠে থাকা সিঁদুর-মাখান অস্পষ্ট মূর্তির আশেপাশে কয়েকটা। বাকী শুধু শাল। তাও মোটা শাল নয়, সবই শিশুশাল। সবুজ চিকন পাতায় ঢাকা সরু শরীর। মাঝে মাঝে কুশের ঝোপ, বনফুলের ঝোপ।

শুকের ভাল লাগছে। এই যে শালের শ্রেণী, বাতা-সের একটা অদ্ভুত গন্ধ, পাখীদের মৃদু ডাক, তার মনে হচ্ছে এই ভীষণ শান্ত আর চুপচাপ এই বনে সে ছোটাছুটি করতে পারে, গাছের পাতায় হাত রাখতে পারে, তরতর করে কোন গাছে উঠতেও পারে। বন যেন বন্ধুর মত আদর নেবার জন্যে শরীর বাড়িয়ে আছে।

শুক কাকীমার পাশে ঘুরছে। মইষেবুড়ীকে প্রণাম করা হয়েছে। এবার ঘুরে ঘুরে বন দেখা। বাবা আর কাকাবাবু আলাদাভাবে ঘুরছেন। নীচুগলায় কী যেন গল্প করছেন। শুকের কানে আসছে না।

শুক একসময় কাকীমাকে বলেই বসল, কাকীমা লাটু-ডাঙ্গালে গুপ্তধন আছে বলে তুমি বিশ্বাস কর?

কাকীমা অবাক চোখে তাকালেন। বললেন, তুই এসব কেমন করে জানলি?

জেনেছি। তুমি বল না।

যত সব পাগলামি!—কাকীমা বললেন, তোর কাকার মাথা খারাপ হয়েছে।

—কাকাবাবু কিন্তু অনেক তথ্য জোগাড় করেছেন। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় কাকীমা, সতীশবাবু ওই ব্যাপারটা জানেন?

—আসল কথা কি জানিস, তোর কাকাবাবুর বরাবরই সতীশ ঠাকুরপোদের উপর রাগ। মানুষটা কিন্তু খুব খারাপ নয়। কথা ও রকম বরাবরই বলে। কবে ওর বাপ ঠাকুরদা মামলা করেছিল তাতে ওর দোষ কী! কাকাবাবু তোর এখনও ভাবছেন, ও শত্রু। ও মা, দেখ্ দেখ্, নাম করতে না করতেই সতীশ ঠাকুরপো!

কাকীমার সঙ্গে লম্বা পা ফেলে শুক এগিয়ে গেল।

সতীশবাবু শুধু হাজিরই নন, গল্পও জুড়ে দিয়েছেন বাবা আর কাকাবাবুর সঙ্গে। তবে বাবাই বোধহয় কথা বলছেন। কাকাবাবু নীরব। দাঁড় করান আছে একটা সাইকেল। তার মানে সাইকেলে এসেছেন। সাইকেলটা নতুন মনে হয়। সূর্যালোকে ঝকমক করছে পার্টস-গুলো। সামনে আলো। বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন মনে হয়। ধুতি আর পাঞ্জাবী গায়ে, হাতে ঘড়ি, মাথার চুল ওল্টান। মুখে অবশ্য পান আছে।

কাকীমা বললেন, ঠাকুরপোও যে এসে হাজির!

সতীশবাবু মুখের পান নাড়া দিতে দিতেই হাসলেন। বললেন, আপনারা তো নিয়ে আসবেন না, খবরও দেন নি এখানে আসছেন। অথচ কপাল দেখুন, ঠিক আমি হাজির হয়ে গেলাম।

—ভালই ত করেছেন!

ভাল, না মন্দ, কে জানে! সকালে বেরিয়েছিলাম। বুঝলেন কি না টাবাডুমরা গিয়েছিলাম একটা লোকের সঙ্গে দেখা করতে। সাইকেলে পার হচ্ছি, এমন সময় দেখতে পেলাম দাদাদের। চলে এলাম।—সতীশবাবু মুখের পান নাড়া দিতে থাকলেন। একটু থেমে বললেন, আমি ত ভেবেছিলাম আপনাদের সঙ্গে আর দেখাই হবে না, সকালেই হয়ত কলকাতা রওনা হবেন।

একটু থেমে সতীশবাবু আবার বললেন, এ ধারটা ভারী বিশ্রী হয়ে গেল বৌদি। আগে চোর-ছ্যাঁচোড় কিছুই ছিল না, এখন ডাকাতি হচ্ছে প্রায়ই—বোমা ফাটিয়ে লুটপাট করছে।

কাকীমা বললেন, আমরা বাপু ভালয় ভালয় যেতে পারলে হয়।

সতীশবাবু শব্দ করে আবার হাসলেন—ডাকাতের নাম শুনেই বৌদি ভয় পেলেন!

ঘরের সামনে মানুষের ভিড়। নানা লোকের নানা কথা। দেখা গেল, শম্ভুদা মুখ ঢেকে কাঁদছে। ঘরের দরজা দুপাট করে খোলা। সব ঘর তো ব্যবহার করা হয় নি। সামনের আর তার পাশের ঘরটা কেবল ব্যবহার হচ্ছে। সামনের ঘরটাতেই ছত্রখান কাণ্ড। জিনিষপত্র ওলটপালট, কাপড়, বিছানা, চামড়ার বাক্স, প্যাণ্ট-জামা, খবরের কাগজ, শাড়ী, ব্লাউজ, সামান্য বইপত্র সব। যেন কোন মানুষ সারা ঘর হাতড়ে কিছু খুঁজেছে। না পেয়ে রাগে আরও এলো-মেলো করে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

কান্নার সুর মিশিয়ে শম্ভুদা জানাল, তাকে একটা লোক তাকে একটা লোক ডাকতে এসেছিল। বলেছিল, 'অঞ্চল অফিসে তোমাকে ডাকছে।' লোকটা শম্ভুদার অচেনা। 'কী দরকার।' শম্ভুদা কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল। লোকটা বলেনি। বলেছিল, 'চল কেনে বাপু। যাবে আর আসবে। ঘরে শিকল দিয়ে দাও।' তা-ই করেছিল শম্ভুদা। অঞ্চল অফিস গাঁয়ের বাইরে। প্রায় গোটা গাঁখানা পরিক্রমা করে যেতে হয়। লোকটা পাশাপাশিই হাঁটছিল নীরবে। তারপর একসময় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে পাশেই মুদিদোকানে ঢুকে-ছিল। হাতে বিড়ি নিয়ে ধরিয়েছিল। শম্ভুদাকেও দিয়েছিল। খানিকটা হাঁটার পর লোকটা বলেছে, 'এখানে দাঁড়াও,

সতীশবাবু বোধ করি বিমূঢ়, গালে হাত রেখে কাকাবাবু বসে, বাবা দাঁড়িয়ে···

কাকাবাবু আড়চোখে সতীশবাবুকে দেখছেন। কিছু বলতে পারছেন না।

বাড়ী ফিরে আবার অবাক। কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড!

আমি আসছি।' বলে সাহাদের বাড়ীটার পাশের গলিতে ঢুকেছিল। শম্ভুদা ভেবেছিল, এক্ষুনি আসবে লোকটা। কিন্তু আসেনি। বেশ কিছুটা অপেক্ষার পর সাহাদের বাড়ীর পাশে সরু গলিটায় ঢুকে লোকটাকে আর দেখতে পায়নি শম্ভুদা। অঞ্চল অফিসে তখন নিজেই চলে গিয়েছিল। গিয়ে দেখেছে বন্ধ। রাস্তার একটা লোককে জিজ্ঞাসা করতে সে বলেছে, 'আজ রবিবার। বন্ধ থাকবে না?' সঙ্গে সঙ্গে শম্ভুদা ঘরে ফিরে এসেছে। এসেই দেখে—এই কাণ্ড!

না, শম্ভুদা মানুষটার চেহারার বর্ণনা দিতে পারল না, ভাল করে সে দেখেই নি। রোগাপানা, গায়ের রঙ ফরসা—ব্যস এর বেশী কিছু বলতে পারে না। কী পরে ছিল—লুঙ্গি, না প্যান্ট, না ধুতি—তাও বলতে পারছে না। তবে গাঁয়ের লোক যে নয়, এ ব্যাপারটা সে জোর দিয়েই বলছে।

কাঁদতে কাঁদতে শম্ভুদার এক কথা—আমার দুষ বাবু! আমার দুষেই এই সব্বনাশ হন্ গেল! অচিনা মানুষ, তার সাথে ঘর ছেড়ে যাবার কথা লয়। কিন্তুক কী যি আমার হন্ গেল, আমি বুঝতে লারছি—শিকল তুলে বেরিন্ গেলাম।

কাকাবাবু হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র হাটকালেন। তার পর হিসাব হল। না, সবই প্রায় ঠিক আছে। মানিব্যাগটা বাক্সের মধ্যে পড়ে। কাকীমার গয়না-পত্র অবশ্য কিছু ছিল না। বাবা কাকা তো ঘড়ি পরেই গিয়েছিলেন। জামা-কাপড়ও সব ঠিকঠাক। কেবল একটা জিনিস নেই, কাকাবাবুর সবুজ রঙের ফাইলটা, যার মধ্যে ডাকাত লাটুর গুপ্তধনের জটিল সব তথ্য ছিল—পুরোনো ম্যাপ, ফিতে, রাস্তার নক্সা, কাকাবাবুর এতদিনকার জোগাড় করা সব কিছু।

কাকীমা কোন কথা বলছেন না, কিন্তু দুচোখে তাঁর আতঙ্ক। রাত্রি নয় এখন, দিনের বেলা, ঝকমক করছে সূর্যের আলো, গাঁয়ের মানুষ সব জেগে, এ সময় কার এত দুঃসাহস!

পাড়ার লোকেরাও কম অবাক নয়—কাকাবাবু ফাইলের কথাটা অবশ্য গোপন করে গেছেন—এমন কাণ্ড ঘটতে তো তারা কখনও দেখেনি। চোর এল, জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করল, অথচ কিছুই নিয়ে গেল না! জামা-কাপড়গুলোও তো মূল্যবান। টাকার ব্যাগে না জানি কত টাকা আছে!

সতীশবাবু বরাবরই রয়েছেন। অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন তিনি। বেশী কথা বলেননি। বোধ করি, তিনিও বিমূঢ়। বারবার কাকাবাবুকে দেখছেন। গালে হাত রেখে কাকাবাবু যেন সর্বস্বান্ত হয়েছেন এমন একটা ভঙ্গিমায় বসে আছেন নিশ্চুপ হয়ে। বাবা চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

যাই হোক, এ ব্যাপারে তো সতীশবাবুকে দোষ দেওয়া যায় না বা সন্দেহ করা যায় না। তিনি তো সকাল থেকেই গাঁয়ের বাইরে। তারপর মইষেবুড়ী বনে দেখাও হয়েছে, একসঙ্গে ঘোরা হয়েছে।

তাহলে কে? কে এসেছিল? কে নিয়ে গেল কেবলমাত্র ফাইলটা?

দুপুরবেলাতে বাবাই ওই প্রসঙ্গ তুললেন। কাকাবাবু তো একেবারে ভেঙে পড়েছেন। কাকীমা একেবারে নিশ্চুপ। ঘরের বাতাস দীর্ঘক্ষণ ভারী হয়েই আছে। কোনক্রমে যেন খাওয়াদাওয়া সারা। বাবা বললেন, বুঝলে কমল, তুমি যে অমন ভাবে মাথা চাপড়াচ্ছ, তার দরকার নেই।

কেন?—কাকাবাবু ফ্যালফ্যাল চোখে তাকালেন। মুখ চোখ যে কী ভীষণ বদলে গিয়েছে!

—তোমার ফাইল পেয়ে কোন মানুষই ব্যাপারটার হদিস করতে পারবে না।

—পারবে, নিরাপদ। সবটা পড়লেই পারবে।

—পারলেও তার কোন লাভ নেই। লাটুডাঙ্গাল তোমার নিজস্ব সম্পত্তি।

তা বটে। তবে সম্পত্তি আগলাবার জন্যে আমি তো বসে থাকব না।—কাকাবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমি কলকাতাতে থাকার সময় খোঁড়াখুঁড়ি চালালেই হল!

—কেন? শম্ভুদা খবর দেবে।

শম্ভুদা!—কাকাবাবু অবাক চোখে তাকালেন। তারপর বললেন, হুঁ।

কাকাবাবুর গলার স্বরে এই প্রথম বুঝি শম্ভুদার সম্পর্কে অবিশ্বাস প্রকাশ পেল।

তুমি যাই বল না কেন নিরাপদ, আমি আর ও ফাইল ফিরে পাব না!—কাকাবাবু মাথা দোলালেন—উঃ! আমার এত দিনের পরিশ্রম, এত বড় একটা স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল!—তবে তবে তুমি জেনে রাখ নিরাপদ, আমি ছাড়ব না, শয়তানকে আমি ধরবই।···তোমরা কলকাতা ফিরে যাও। হ্যাঁ, আমার ছুটি এক্সটেনশান করানোর একটা চিঠিও নিয়ে যেও। শুকের কাকীমাকেও নিয়ে যাও। আমি একলাই থাকব এখানে।

কাকাবাবুর কথায় ঘরের মধ্যে ভয়ের বাতাস আরও থমথম করতে থাকল।

বাবা বললেন, পাগলামি করো না, কমল।

কথাটা বোধ হয় কাকাবাবু শোনেননি। বললেন, আমি বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, ব্যাটা এজন্যেই আমার পিছনে লেগেছিল। দাঁড়াও, তোমাকে সম্পত্তি নেওয়াচ্ছি!

বলে না দিলেও সবাই বুঝতে পারছিল, সতীশবাবুর উপরই কাকার এই উষ্মা।

॥ সাত ॥

শুকের লাটুডাঙ্গাল দেখতে আসা সার্থক হল। একলাই এসেছে এই ঘুটঘুটে দুপুরে। কাকাবাবুর জন্যে মন ভারী খারাপ। বিছানায় শুয়ে আছেন তিনি। কাকীমার সে জেদ আর নেই। তবে তিনি কাকাবাবুর এই অবস্থা দেখে অসম্ভব ভয় পেয়েছেন। শুক বুঝতে পারছে, এখানে বেড়াতে আসাটাই ভুল হয়েছে। কোথায় আনন্দ করা হবে, ম্যাসাঞ্জোর যাওয়া হবে, জয়দেব-তারাপীঠে বেড়ান হবে, পুকুর কাটা হবে, আবিষ্কৃত হবে ডাকাত লাটুর অতুল ঐশ্বর্য—তা নয়, ঘরের মধ্যে কেবল কালো ছায়া, আতঙ্কের থমথমানি। কে জানে, ডাকাত লাটুর আত্মা হয়ত মুক্তি পায়নি, অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এসব অঞ্চলেই। আগলে আছে তার অতুল ঐশ্বর্য। যে হাত বাড়াবে, তারই উপর ভর করবে, তাকেই ভয় দেখাবে। হয়ত কাকাবাবুর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে এ সব কাণ্ডকারখানা অলক্ষ্যে থেকে সে-ই করছে। কে জানে, আরও ভয়ঙ্কর কিছু করবে কিনা! মনে হচ্ছে, বাবাও ভয় পেয়েছেন।

ডাঙ্গাল নামটা কেন কে জানে! ডাঙ্গা মানে তো এখানে জলের বাইরে উঁচু জায়গা নয়, রুক্ষ বৃক্ষহীন প্রান্তরকেই ডাঙ্গা বলে। সে হিসাবে লাটুডাঙ্গাল একে বলা যায় না। লাটুবন বললেই হয়। এর চারিদিকেই ধানক্ষেত আর ধানক্ষেত। উঁচু বেশ কয়েক বিঘে জমি, ঝোপঝাড় আর কাঁটাবন। ভেতরে শুক ঢোকেনি। বাইরে থেকেই দেখতে পাচ্ছে। না, মানুষ যাতায়াতের অযোগ্য। সামলে চললেও গায়ে কাঁটা বিঁধবেই।

চারিদিকে আশ্চর্য নির্জনতা। কোথায় যেন ডাহুক ডাকছে। মানুষজনের চিহ্ন নেই। হঠাৎ শুকের চোখে পড়ল, ধবধবে সাদা পাতা আর ভাঁজ করা কী যেন মাঠের উপর পড়ে। ছুটে গেল শুক।

ধানক্ষেতের মাঝে একটা বিশাল কালো পাথর। তার পাশেই কাগজগুলো। লাটুডাঙ্গালের একেবারে উল্টোদিকে অর্থাৎ কিনা গাঁ থেকে দেখা যাবার কথা নয়। যেন পাথরে বসে কেউ কাগজগুলো দেখে নিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

একটা পাতা তুলতেই যেন চোখ ঝলসে গেল শুকের: ও মা, এ যে কাকাবাবুর হাতের লেখা! ওই তো ম্যাপ! ব্যস্ত উত্তেজনাভরা হাতে শুক কাগজ গোটাতে থাকল। চারপাশ একবার দেখে নিল। একপাশে অবশ্য লাটু-ডাঙ্গালের আড়াল। বুক ধড়ফড় করছে।

না, শুক এখন কিছুই ভাবতে পারছে না। আর কোথায় পড়ে আছে! আর কোথায়! শুকের চোখ খুঁজে বেড়াতে থাকল। সবুজ রঙের ফাইলটা কোথায়? না, নেই। কাগজগুলোই এখানে ফেলেছে। হয়ত ফাইলটা অন্য কোথাও ফেলে থাকবে।

কাকাবাবু হাতে কাগজগুলো দিতে উল্লাসে ফেটে পড়লেন তিনি। তারপর উলটে-পালটে দেখতে থাকলেন। উত্তেজনার সে মুহূর্তে তিনি শুককে জিজ্ঞাসা করতেও ভুলে গেলেন, 'শুক এগুলো কোথায় পেলি?' শুধু

দ্রুত কাগজগুলো ওলটাতে-ওলটাতে বাবাকে বার বার বলছেন, 'তোমার কথাই ঠিক, নিরাপদ! মুখ্যু ব্যাটারা এসবের মর্ম বোঝেনি!' বাবা বললেন, এগুলো কোথায় পেলি শুক?

শুক সব কথাই বলল। কাকাবাবু বললেন, তা হলে ধারে পাশে বাকী কাগজপত্রও পাওয়া যাবে।

লাটুডাঙ্গালের ভেতরে ঢুকিসনি তো?—কাকাবাবু বললেন, ওখানে থাকতে পারে! হ্যাঁ, ওখানে ফেলে দিতে পারে! চল্ দেখি।

বাবা অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠলেন, আঃ কমলেশ, তুমি এত বড় একটা কাজ করছ অথচ নিজেকে সামলাতে শিখলে না। গুপ্তধন যদি পাওয়া যায়, তুমি উল্লাসে এত জোর চিৎকার করবে যে, গোটা তোমাদের জেলার লোক শুনতে পাবে! ওখানে কাগজপত্রের খোঁজ করতে যাওয়া মূর্খামি হবে। বরঞ্চ তুমি যতটা পার গোপন করে রাখ।

—কিন্তু কাগজগুলো যদি ওখানে পড়ে থাকে, তাহলে তো কুড়িয়ে আনা উচিত। বলা যায় না, হঠাৎ বৃষ্টি নামতে পারে। ও ব্যাপারে দেরী করে লাভ নেই।

বাবা বললেন, একটু ঠাণ্ডা হও। ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে ব্যাপারটা ভাব।

কাকাবাবু চুপচাপ কাগজগুলো দেখতে থাকলেন। শুক, বাবা, কাকীমা নীরব। শম্ভুদা দরজার বাইরে থেকে অবাক চোখে দেখছে। বোধ করি, টের পেয়েছে, কাকাবাবু হারান ধন ফিরে পেয়েছেন। তবে পরিষ্কার করে সে বুঝতে পারছে না।

শুক বাইরে বেরুতে শম্ভুদা বলল, কী হল খুকাবাবু? বাবু অমন করছে কেন?

শুক একবার শম্ভুদার মুখ দেখে নিল। তারপর বলল, কিছু হয়নি তো!

—কিছু চুরি গেইছে নাকি বাবু? আঁ, কিছু চুরি গেইছে?

শুক বলল, বা রে, চুরি যাবে আবার কী! কিছু চুরি যায় নি।

—বাবু যি কী বলছেক!

শুক এবার বিরক্ত বোধ করল। বলল, তোমার এসবে দরকার কী শম্ভুদা?

শম্ভুদা বুঝি লজ্জা পেল। বলল, তা বটে। তা বটে খুকাবাবু।

হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে কাকাবাবুর চিৎকার শোনা গেল—পেয়েছি! পেয়েছি!

বাবা বললেন, কী পেলে কমলেশ?

এখন নয়, এখন নয়। উহুঁ, কাউকে বলব না।—কাগজখানা চোখের সামনে রেখে মাথা দোলাতে দোলাতে কাকাবাবু বললেন, শয়তান, এবার আমার হাতেই প্রমাণ!

কাকাবাবুকে এর পর থেকেই পাগলপ্রায় মনে হতে থাকল। তবে তিনি যে পাগল হন নি, তা বোঝা গেল, ঠিক দুটো দিন পর।

দুটো দিন কাকাবাবু ভয়ঙ্কর ব্যস্ত থাকলেন। না, এবার আর কাগজপত্র নিয়ে ঘরের ভিতর নয়। বাইরে। যখন-তখন বাইরে বেরিয়ে যান। আবার ফিরে আসেন। বাবাকে সঙ্গে নেন না। শুক তক্কে তক্কে থেকেও কিছু হদিস করতে পারে না। একদিন শুক দেখে, কাকাবাবু ধান-মাঠে ঘুরছেন, নদীর উপর এক সময় হাঁটুতেও দেখা দেখা গেল, গাঁয়ের ভেতরও এ ঘর ও ঘর ঘুরে বেড়ালেন। কথা একটিও বলেন না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায়। তবে গাঁয়ের সন্ধ্যে তো, রাত্রি বলেই মনে হয়। আকাশ জোড়া নক্ষত্রের মেলা। চাঁদ নেই। ফিকফিকে অন্ধকার। সামনের দৃশ্যও দেখা যায় না। ঘরের বারান্দায় একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। মধ্যে মধ্যে কুকুরের হাঁক শোনা যাচ্ছে। অপার স্তব্ধতা। কাকাবাবু তখনও ফেরেন নি। সকলেই তাঁর পদশব্দ শোনার অপেক্ষায়। একটু শব্দ হলেই বাইরের দরজার দিকে চোখ চলে যাচ্ছে। এমন সময়—

এমন সময় বন্দুকের শব্দ। পরপর দুটো। গুড়ুম! গুড়ুম!

তারপর আবার স্তব্ধতা। শব্দটা দূরে না। তারপরেই

যেন বিস্ময় কাটতে না কাটতেই একটা সোরগোল শোনা গেল। কাকীমা রান্নাঘর ছেড়ে বাইরে, বাবাও।

হ্যারিকেন নিয়ে বাবা বেরিয়ে পড়লেন। শুক পিছনে। যাবার আগে বাবা বললেন, শম্ভুদা, তুমি ঘরে থাক।

কাকীমাকে বললেন, আপনিও থাকুন।

বাইরে বেরিয়ে দেখা গেল, গাঁয়ের মানুষ বেরিয়ে পড়েছে। কারও হাতে টর্চ, কারও হাতে হ্যারিকেন। সকলেরই এক জিজ্ঞাসা—কী হয়েছে? কী হয়েছে? তার সঙ্গে নানাজনের নানান মন্তব্য। কাছেই ফুটেছে বন্দুক। কেউ বলে উত্তরে, কেউ বলে দক্ষিণে। বেশীর ভাগ লোক লাটুডাঙ্গালের দিকটাই আঙুল দিয়ে দেখায়। কিছুক্ষণ আগে গাঁখানা ঘুমন্ত মনে হচ্ছিল। এখন মানুষের শব্দ, চারিদিকের আলোয় মনেই হয় না সে কথা।

সতীশবাবু বেরিয়ে এসেছেন। শুককে দেখেই অবাক। সতীশবাবু বললেন, কী ব্যাপার!

একটু থেমে বললেন, কমলদাকে দেখছি না।

বেরিয়েছে। ফেরেনি।—বাবা বললেন।

কী আশ্চর্য!—সতীশবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, কমলদার এ কী কাণ্ড! কোথা গেলেন? চলুন। চলুন দেখিগে। তাঁরই কোন বিপদ হলো না তো!

বাবা পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শুকের শরীর থরথর করে কাঁপছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে শোনা গেল, এক ডাকাতদল ধরা পড়েছে লাটুডাঙ্গালে। না, কাকাবাবুর তখনও সাড়াশব্দ নেই।

গাঁয়ের ভিতর যখন পুলিসের দল ডাকাতদের ধরে নিয়ে ঢুকল, তখন দেখা গেল কাকাবাবুকে। দারোগা সাহেবের সঙ্গে হেঁটে আসছেন। মুখে বিজয়ীর হাসি। গল্প করছেন।

বাবা ছুটে গিয়ে বললেন, উঃ কমল, তোমার জন্যে কী যে ভাবছিলাম!

কাকাবাবু হাসলেন।

দারোগা সাহেব গাঁয়ে এসে কাকাবাবুদের ঘরেই উঠলেন। দাওয়ায় চেয়ার বের করে দেওয়া হল। ডাকাতদলকে ঘিরে রইল পুলিস উঠোনে। কেউ পালাতে পারেনি। পালাতে চেষ্টা করলেই পুলিস ফায়ার করেছে।

এদিকে ঘরের উঠানে যেন মেলা। গাঁয়ের সব মানুষ এসেছে।

দারোগা সাহেব বললেন, জানেন, এই কমলবাবুর জন্যেই ডাকাতদল ধরা পড়ল। উঃ, গোটা অঞ্চলটাকে জালিয়ে দিয়েছিল মশাই! যাক, এবার এ অঞ্চলের লোক নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে। এই যে, সতীশবাবুও আছেন দেখছি। প্লিজ কিছু মনে করবেন না, আপনার ঘরটা সার্চ করব।

আমার ঘর!—সতীশবাবু আকাশ থেকে পড়লেন।

দারোগা সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলুন চলুন, দেরী করে লাভ নেই।

সতীশবাবু বললেন, আমার ঘর সার্চ কেন স্যার! আমি কমলবাবুর রিলেটিভ। ডাকাতদলের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ওদের জিজ্ঞেস করুন। ওরা আমাকে চেনেই না।

—কেন কথা বাড়াচ্ছেন সতীশবাবু!

—বলবেন তো কেন সার্চ করবেন।

আপনি অবশ্য সার্চ করতে আপত্তি জানাতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমাকে পারমিশান করিয়ে আনতে হবে। তা করিয়ে আনব। তবে আপনার বাড়ীর চারিদিকে আজ থেকেই পুলিস বসবে। হ্যাঁ, সার্চ কেন করব জানেন? আমাদের সন্দেহ: ওদের চোরাই সোনা সব আপনার ঘরে আছে।—দারোগা সাহেব হাসলেন,—কা, মিথ্যে কথা?

—নিশ্চয়ই স্যার।

—ব্যস। তাহলে সার্চ করতে দিতে আপত্তি কোথায়!

সতীশবাবুর মুখে আর রাটি নেই।

সতীশবাবু ঘর সার্চ করতেই সোনা পাওয়া গেল। পঁচিশ খানা হার, সোনার বালা, কানের দুল, চুড়ি ইতাদি নানান অলঙ্কার। না, মাটিরতলায় পোঁতা ছিল না, সবই সাজান ছিল বাক্সে।

সতীশবাবু মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন।

কিন্তু এর ভেতর একজনকে পাওয়া গেল না। সে শম্ভুদা।

কাকাবাবু ডাকলেন, শম্ভুদা! শম্ভুদা!

নেই। সকলেই এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকল।

কাকাবাবু বললেন, এই যে দলের সর্দার স্যার। এ শম্ভুদার ছেলে। শম্ভুদা আমাদের ঘরজমিজায়গা দেখাশোনা করত।

গাঁয়ের লোকেরা বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে।

দারোগা বললেন, 'ডাকাতের বাপের জিম্মায় ঘর রেখেছিলেন!

ডাকাতদলের অনেকেই চেনা। বেশীর ভাগই আশে-পাশের গাঁয়ের লোক। সোনাচরেরও একজন আছে। প্রায় সকলেই দাগী। এদের মধ্যে শম্ভুদার ছেলেই নতুন।

দারোগা সাহেব ওঠার আগে বললেন, থাকতে পারবেন তো কমলবাবু?

—কেন?

—না, মানে এদের দলের কেউ যদি ছিটকে থাকে, সে আক্রমণ করতে পারে। বলেন তো পুলিস রেখে যাই দুজন। আর আমি এই কেসটায় যাতে আপনি পুরস্কৃত হন তার চেষ্টা করব।

কাকাবাবু নয়, গাঁয়ের লোকই প্রতিবাদ করল—কী যে বলেন! কমলবাবুকে আমরা দেখব। গাঁয়ের কত বড় উপকার উনি করলেন!

পুলিস ডাকাত নিয়ে চলে যেতে অনেকেই থাকতে চাইল। কাবাবাবু বললেন, আপনারা তো পাশেই থাক-লেন। দরকার হলেই ডাকব। আর আমি নিরস্ত্র নই।

বিজয়ীর মত হাসলেন কাকাবাবু!

॥ আট ॥

রাত্রিবেলায় সবাই চলে যাবার পর কাকাবাবু কথা শুরু করলেন। শুক একলা নয়, সকলেই শোনার জন্য ব্যস্ত। এমন কি কাকীমা পর্যন্ত।

কাকাবাবু বললেন: কাগজগুলো হাতে পাওয়ার পর দেখি ফোঁটা ফোঁটা লাল দাগ। সন্দেহটা আমার তখনই হল। উত্তেজনায় আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। পর মুহূর্তে অবশ্য সামলে নিয়েছি। তোমাদের কিছু বলিনি। কেননা শুধুমাত্র ওটা দিয়ে তো প্রমাণ করা যায় না। যাই হোক, লাল দাগ দেখে আমি প্রথমে রক্ত বলে মনে করেছিলাম। চকিতে মনে পড়ে গেল, সতীশ পান খায়—এ নির্ঘাত পানের দাগ। মনে করে দেখলাম, যেদিন এসব কাগজপত্র চুরি যায়, সেদিনই আমরা মইষেবুড়ী বনে গিয়ে-ছিলাম। সেখানে সতীশও ছিল। তাহলে কি সতীশ চুরি করেনি? ও বলেছিল, সকাল থেকে বেরিয়েছে। বুঝলে, সন্দেহটা আমার আরও উগ্র হল। ভেবে দেখলাম, কাণ্ডটা যে হবে অর্থাৎ ওরই সম্পূর্ণ পরিকল্পনা সেটা যাতে না ধরতে পারি কিংবা এর সঙ্গে ও জড়িয়ে আছে সে সন্দেহ না করি, তাই আগেভাগেই দায়মুক্ত হয়ে থাকতে চাইছিল। ওকে ধরলে ও বলে দিত, 'আমি তো সকাল থেকে বাইরে ছিলাম।' তাছাড়া ও আর একটা কথাও বলেছিল, তোমাদের বোধ হয় মনে নেই। বলেছিল, 'ভেবেছিলাম আপনাদের আর দেখতেই পাব না। সকালের গাড়ীতেই হয়ত রওনা হয়ে গিয়েছেন।' এ কথাটাও ওর সন্দেহমুক্ত হয়ে থাকবার একটা হাতিয়ার হত। অপরাধীর অবচেতন মনের ক্রিয়া এটা। হ্যাঁ, পানের দাগ তো পেলাম। সতীশকেও মনে মনে দোষী বলে পাকড়ালাম। কিন্তু সতীশ যে লণ্ডভণ্ড করেনি সেটা তো ঠিক। তাহলে কে করেছে? নিশ্চয়ই অন্য লোক। অবশ্য করেছে সতীশের কথাতেই। কিন্তু শুধু শুধু তো করবে না? আর খুব ঘনিষ্ঠ লোক না হলে সতীশের কথায় কেউ আমাদের ঘরে ঢুকতে চাইবে না! তাহলে সেই ঘনিষ্ঠ লোকটি কে? আর সতীশের জন্যে এমন ভয়ঙ্কর কাজটা করতে তারই বা কী স্বার্থ? জান, তখনও ডাকাতদল ইত্যাদি কিছুই আমি কল্পনাও করতে পারিনি। ঘনিষ্ঠ লোক কে ভাবতে ভাবতে আমি ঠিক করলাম, গাঁয়ে ঘুরে নানা সূত্র থেকে জেনে নেব। নিশ্চয়ই বার করতে পারব। কিন্তু তার আগে আর একটা প্রশ্ন আমার মাথায় জেগে উঠল: আমাদের তাড়াতে চায় কেন? লাটুডাকাতের গুপ্তধন আবিষ্কার করতে চাইছি তা তো ও জানে না। তার উপর ধর, ও কাগজপত্র পেয়েও ফেলে দিয়েছে। তার মানে বিশ্বাস করেনি বা বাজে জিনিস ভেবেছে। কাগজপত্রের মধ্যে তো গুপ্তধনের কথা লেখা নেই। শুধু লাটুডাঙ্গালের সম্পর্কে কিছু লেখা, নক্সা, দাগ নম্বর, প্রকৃত এলাকাটার মাপজোক ইত্যাদি

আছে। কিন্তু তাহলেও ওটাই যদি ওর মুখ্য উদ্দেশ্য হত, অর্থাৎ আগে কোনক্রমে আমার কথা শুনে আগ্রহান্বিত হত, তাহলে নিশ্চয় রেখে দিত। রাখেনি। তার মানেই হচ্ছে আমাদের তাড়ানোর পিছনে ওর একটা ভিন্ন উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্যটা কী? নানারকম ভাবছি। হঠাৎ শম্ভুদাকে নিয়ে যাওয়া লোকটার কথা মনে পড়ল। যে নিয়ে গিয়েছে, সে লণ্ডভণ্ড করেনি, সতীশও না। তাহলে এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে তিন জন। জান, তোমরা যাই ভাব না কেন, শম্ভুদাকে আমার সামান্য সন্দেহ হয়েছিল। তারপর ভাবতে গিয়ে যখনই মনে হল, আশেপাশের গাঁয়ের সকলকেই শম্ভুদা চেনে—সোনাচরের মানুষদের তো বটেই—তখন সন্দেহটা আমার পাকা হয়ে গেল। শম্ভুদা চিনেছে মানুষটাকে। আমার কাছে গোপন করেছে। এ গাঁয়েই শম্ভুদা সারাজীবন কাটাল, এ গাঁ কি আশেপাশের গাঁয়ের মানুষ চিনবে না? তা কি হয়! আর সতীশ তো বাইরে থেকে মানুষ আমদানি করতে পারে না। ঠিক করলাম, শম্ভুদাকে চেপে ধরব। ঠিকমত ধরতে পারলে ও নিশ্চয়ই স্বীকার করে ফেলবে। কিন্তু শম্ভুদাকে চেপে ধরতে হল না। তার আগেই আর একটা কাণ্ড ঘটে গেল। বলতে পার, একেই বলে নিয়তি। আমার হাত দিয়ে ওদের ধরা পড়ার নিয়তি। সেদিন তোমরা তো সব শুয়ে পড়লে। কিন্তু আমার ঘুম নেই। বিছানায় শুয়ে আছি। হ্যারিকেনটা খুব অল্প করা। ঘরে কোনরকমে যেন সামান্য আলো। খিল লাগাইনি। দরজাটায় আলগা করে কপাট লাগান। উঠে খিল লাগাব ভাবছি। কিন্তু যাচ্ছি না। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। জানালা দিয়ে দেখলাম, আকাশভরা নক্ষত্র। কোন সাড়াশব্দ নেই। একঝটকা বাতাস এসে টেবিলের উপর রাখা হ্যারিকেনটা নিবিয়ে দিল। গাটা আমার কেমন যেন ছমছম করে উঠল। কেন করল নিজেও বুঝলাম না। উঠে জ্বালানর উৎসাহ হল না। তারপর কী মনে হতে, অন্ধকারে কতক্ষণ কেটেছে জানি না, এক-সময় উঠলাম। দরজাটা বন্ধ করব ভাবছি, তখনই ফিসফিস করা গলা পেলাম বারান্দায়, 'বাবা!' আমি থমকে দাঁড়ালাম। তারপরই খুব আস্তে দরজা খোলার শব্দ পেলাম। হ্যাঁ, শম্ভুদার ঘরের দরজা খোলার। আবার দরজাটা সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হল। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি দরজা খুললাম। না, কোন শব্দ হল না। সন্তর্পণে হাত বাড়িয়ে টেনে দরজা বন্ধ করলাম। তারপর শিকারী বিড়ালের মত নিঃশব্দে বারান্দা ধরে এগিয়ে যেতে থাক-লাম। শম্ভুদার ঘরের কপাটের পাশে দাঁড়াতেই চাপা গলায় শম্ভুদাকে ভৎর্সনা করতে শুনলাম। শম্ভুদা যা বলছিল, তা হল: 'তোর জন্যে বাবুর মাথা খারাপ। কেন বাবুর পেছনে লাগতে গেলি? ক দিনই বা বাবু থাকবেন? তারপর তোরা যা খুশি তাই কর্। তোরা আবার বাবুর কাগজপত্র ফেলে দিয়েছিলিস। বাবু তো তোদের শত্রুতা করেনি। কেন এসব করবি? এসব করলে আমি ফাঁস করে দেব সব।' আর একটা গলা বোঝাবার চেষ্টা করল: 'বাবা, তুমি যে কেন লাফাচ্ছ! তোমার বাবুকে কিছুই করা হয়নি। স্রেফ একটু ইয়ার্কি! সতীশবাবু বললেন, তাই। উনি বলেছিলেন কাগজ নিয়ে ব্যাটা কী ঘাঁটাঘুঁটি করে দেখতে হবে। তাই তো কাগজপত্রগুলো কেবল নিয়ে গিয়েছিলাম। তা ফেলেও দিয়েছি। ধুস্, কিছুই নাই। সতীশবাবু বলল, তোমাদের বাবু নাকি লাটুডাঙ্গালকে সাফসুফ করবে জমি চাষের লেগে। তার জন্যে নকসা পরচা ঠিকঠাক করছে।' হি হি করে হাসল শম্ভুদার ছেলে। তারপর বলল, 'আর তুমি যে কেন বুঝছ না ঘর আমাদের তাড়াতাড়ি দরকার।' শম্ভুদা বলল, 'সতীশবাবু বললেই তার কথা শুনতে হবে?' ছেলে বলল, 'কী যে বল বাবা! সতীশবাবুই আমাদের দলকে বাঁচিয়ে রেখেছে। চোরাই জিনিস বিক্রি করতে গেলে ত ধরা পড়ব। আমরা অবশ্য টাকা আর গয়না ছাড়া কিছু ডাকাতি করি না। তা গয়না তো বিক্রি করতে হবে। সতীশবাবু কম দাম দিক, কিন্তু সব কেনে তো! তারপর ধর, এই যে বাবুদের ঘরে আমরা জমায়েত হই, এখান থেকে দল নিয়ে বেরুই, তা সতীশবাবু জানে। ওর কথা শুনতে হবে না? আর তোমার বাবুরা গেলে আমাদের তো লাভ। জমায়েত হতে পারছি না।' শম্ভুদা বলল, 'দু-একদিন বন্ধ রাখ্।' ছেলে বলল, 'কী যে বল! বন্ধ কি রাখা যায় নাকি? দলের সবাই

পুরন্দরপুর যাবার জন্যে লাফাচ্ছে। পুরন্দরপুরের সাহারা বিরাট বড়লোক। ব্যাটাদের ঘরে এবার আমরা ঝাঁপাব।' শম্ভুদা বললে, 'তুকে একটা কথা বলব গদাই।' 'বল, কী বলবে বল।' শম্ভুদার ছেলে বলল, 'সতীশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। ভাবলাম, যাই তোমার কাছেও ঘুরে যাই। সতীশবাবু বলছিল তুমি আমাকে

দেখা করতে বলেছ।' শম্ভুদা বললে, 'এসব তুই ছেড়ে দে। অনেক টাকা হয়েছে। আবার টাকার কী দরকার?'

বেশ কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ। আমি পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। উত্তেজনায় আমার এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা যে, খেয়ালও নেই, হুট করে দরজা খুললেই কী মারাত্মক ব্যাপার হয়ে যাবে। আমি বোধহয় চিৎকার করবারও অবসর পাব না। তার আগেই খতম করে দেবে। বেশ কিছুটা নীরবতার পর শম্ভুদার ছেলে গদাই বলল, 'বাবা, বাবুরা কবে যাবে মনে হয়?' শম্ভুদা নীরব। গদাই বলল, 'কী যে তুমি, ঠিকঠাক খবর দিতে পারছ না। কবে যাবে তাও যদি জানাতে পারতে।' শম্ভুদা বলল, 'নিজেদের ঘরে এসেছে। কবে যাবে শুধুবো কেমন করে?' গদাই বলল, 'তাইত ঠিক করলাম, পরশু পুরন্দরপুর যাব। দলের লোকদের জানিয়েও দিয়েছি। সন্ধ্যের পর লাটুডাঙ্গালের কাছে সব জমায়েত হবে। ব্যাটারা থাকতে ত আর এখানে কিছু করা যাবে না।'

বুঝলে, আমি আর দাঁড়ালাম না। দ্রুত সরে আসতে গেলাম, অমনি শব্দ উঠল একটা। 'বাইরে কে?'—ভেতর থেকে গদাইয়ের গলা বেজে উঠল। আমি ততক্ষণে ঘরে ঢুকে পড়েছি। বুক ঢিপ ঢিপ করছে আতঙ্কে। তবে বাইরের কোন শব্দ আর শোনা গেল না। বেশ কিছুটা পরে শম্ভুদার ঘরের দরজা খুলল। বোধ করি, বেরিয়ে গেল। আমি বিছানায় কাঠ হয়ে শুয়ে থাকলাম। খিল পর্যন্ত লাগালাম না।

হাঁ, শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, এটাই ভাল হল। দল কে দল মুঠোর ভেতর পাওয়া যাবে। পরশু সন্ধ্যের পর ওরা লাটুডাঙ্গালে গিয়ে জমায়েত হবে, তখনই পুলিসী আক্রমণ চালাতে হবে।

তীব্র উত্তেজনায় সারারাত ঘুম হল না। গদাই কিনা শম্ভুদার ছেলে! অথচ শম্ভুদা বলে, ছেলের কোন খবর নেই, কয়লাখাদে কাজ করতে গিয়ে আর ফেরেনি। নিজের কানে না শুনলে আমি হয়ত এ ব্যাপারটাকে বিশ্বাসও করতে পারতাম না। অমন সাদাসিধে মানুষ শম্ভুদার ভিতর কি করে যে এত রহস্য থাকে! আমি ওকে এত বিশ্বাস করি, আর ও কিনা আমার ঘরেই ডাকাত-দলের আড্ডা বসিয়েছে।

পরের দিন শম্ভুদাকে বললাম, শম্ভুদা আর থাকব না। এবার আমরা কলকাতা ফিরব।

—কেনে বাবু? থাকবেন না কেনে?

—বেশ কটা দিন তো কাটালাম শম্ভুদা। তারপর সোনাচর যা জায়গা হয়েছে!

শম্ভুদা নিশ্চুপ।

আবার তোমাকে একলা থাকতে হবে শম্ভুদা!—আমি কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, তাও ছেলে যদি তোমার থাকত। বিয়ে-থা দিয়ে ঘর সংসার করে দিতে পারতে।

শম্ভুদা ফুঁপিয়ে উঠল—বাবু, আমার কপাল! তা না হলে কয়লাখাদে ব্যাটা আবার যায়!

—খোঁজখবর কর নি শম্ভুদা?

শম্ভুদার দু চোখ জলে ভরে উঠল—বাবু, খুঁজেছিলাম। কুনু সন্ধান পাই নাই। আমার কপাল!

আমি আর কথা বাড়ালাম না। বুঝলাম, কালকের ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করেনি। কিন্তু কেমন করে জানব ওরা পরশুই জমায়েত হবে? ঠিক করলাম, গাঁ আর তার আশেপাশে ঘুরতে হবে। আর তা করতে

গিয়ে বিপদে পড়লাম। অবশ্য বিপদ একে ঠিক বলতে পারব না। তবে বিপদ হতে পারত, যদি ওরা কোনক্রমে সন্দেহ করত আমি ডাকাতদলের অস্তিত্ব জেনেছি। জান, আমাকে তাহলে আর এ গল্প শোনাতে হত না। পরশু দিনই লাশ হয়ে যেতাম! আমি তো বেড়াচ্ছি। লাটুডাঙ্গা-লের উল্টো দিকে গিয়েছি, যেখানে শুক কাগজগুলো পেয়েছিল। গাঁয়ের একেবারে বিপরীত দিক ওটা। দূরে কোন গাঁ নেই। খালি ধানক্ষেত, রুক্ষ প্রান্তর, গাছ। মহুয়ার বেশ কিছুটা দূরে বন। হঠাৎই যেন একটা খেজুরগাছ থেকে মানুষ বেরুল। হ্যাঁ, আমার তাই মনে হল। কী চেহারা! দেখলেই ভয় করে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, তালগাছের মত বুকের পাটা, খালি গা। কেবল কোমরের নীচে বাঁধা লুঙ্গি। সামান্য ভুঁড়ি আছে। ড্যাবড্যাবে চোখে আমাকে দেখছে।

আমার রক্ত তখন হিম। তবু পকেটে হাত ভরলাম আমি, যেন পকেটে আমার রিভলভার আছে। কিন্তু লোকটা ত তা বুঝবে না। ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সাহস সঞ্চয় করে বললাম, 'হ্যাঁ হে, এদিকে পাখি পাওয়া যাবে? এই ধর, খাবার মত পাখি। আমার অবশ্য বন্দুক নেই। রিভলভার আছে। তবু চেষ্টা করে দেখতাম। বনপায়রার মাংস তো ভালই। মানিকজোড়, শ্যামকলই বা মন্দ কী?'

লোকটা এবার এগিয়ে এল। বলল, 'অ! আপনি কলকাতার বাবু।'

বললাম, 'তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।'

আমি অবশ্য চিনতে পেরেছিলাম ঠিকই। তবে ওর মতই অভিনয় করলাম আর কি! চেহারায় নয়, মুখে শম্ভুদার সঙ্গে খুবই মিল।

—'আমি এখানকার লোক নই। সোনাচরে কাকার বাড়ী এসেছি। বাগদী পাড়াতে।'

মনে মনে আমি হাসলাম। বললাম, 'অ।'

—'তা পাখি তো এদিকে পাবেন না। পাখি মারতে হলে নদীর ধারে যান।'

—'নাঃ, পাখি আর মারব না। বেড়াতে এসেছি। যদি দেখতে পাই আর কি, এক-আধটা।'

লোকটা আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'বাবুরা কি কিছুদিন থাকবেন?'

একটু থেমে বললাম, 'থাকব ত ভাবছি। কিন্তু···

লোকটা যেন লুফে নিল কথাটা—'এ জায়গাটা ভারী বিশ্রী হয়ে গিয়েছে বাবু। আমিও চলে যাব। আবার ও দিকে নগরে কলেরা লেগেছে। এ গাঁয়ে আসতে আর কত দেরী!'

আমি চমকে ওঠার মত বললাম, 'নগরে কলেরা লেগেছে।'

'হ্যাঁ বাবু, মারা পর্যন্ত গিয়েছে ক জনা!'—লোকটা যেন শিউরে উঠল।

বুঝলাম, আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। না, খুন করার মতলব নেই। আসলে ভয় দেখাতেই আমার সামনে আবির্ভূত হয়েছে। বললাম, 'তাহলে ত আর একদণ্ডও থাকা উচিত নয়।'

লোকটা যেন খুশী হল। বলল, 'সে কথা বলতে! রোগ ধরলে হাসপাতালে ওষুধও নাই।'

যেন চিন্তিত এমন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি। লোকটা পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল।

বাবা বললেন, ডাকাতি করে, অথচ এত বোকা! তুমি তো খবর নেবে। নিয়ে জানবে, কলেরা হয়নি। এটা পর্যন্ত ভাবে নি। নাঃ, বড্ড বোকা তোমাদের এখানকার ডাকাত।

কাকাবাবু হাসলেন—আসল ব্যাপার কী জান, আমাদের তাড়াবার জন্যে ওরা এমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে, বুদ্ধিও ঠিকঠাক খাড়া করতে পারছিল না। হ্যাঁ, তারপর শোন, ওরা যে জমায়েত হবেই এবং আজকেই তাও আমি জানতে পারলাম আজ সকালেই। হ্যাঁ, ওই বেড়াবার সূত্রেই। সতীশের বাড়ীর একটা লোককে দেখলাম তিনটে মুরগী ঝুলিয়ে আনতে সাঁওতালপাড়া থেকে। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল না সতীশ তিনটে মুরগী কী করবে। তবে অনুমান করে নিতে পারলাম, ডাকাতদলের জন্যেই মুরগী তিনটে কাটা হবে আর রাঁধা হবে সতীশের ঘরেই। এবং আজকেই। পুলিসকে খবর দেবার জন্যে তারপরই ছুটলাম। ছ মাইল দূরে থানা। সারা রাস্তা আমি পিছনে তাকিয়েছি। না,

ওরা ফলো করেনি। যাই হোক, থানাতে দারোগা-সাহেবকে বোঝাতেও আমার কম সময় যায় নি। আমাকে চেনেন না। এখানে থাকিও না। প্রথমে তো আমাকেই সন্দেহ করে বসলেন—ডাকাতদলের আমিও একজন, ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে গণ্ডগোল হতে আমি ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। ওঁর ভ্রূ কুঁচকে কথা বলার ভঙ্গী দেখেই আমার তাই মনে হচ্ছিল আর কি! তারপর আমার অফিসের নাম, এখানে যে জমি-জায়গা আছে ইত্যাদি খুঁটিনাটি সব কিছু বলতে তিনি যেন বিশ্বাস করলেন।

বাবা বললেন, তারপর তিনি এলেন। পাকড়াও করলেন। কেমন?

কাকাবাবু হেসে উঠলেন—হ্যাঁ, উলট্‌পুরাণ হয়ে হয়ে গেল! ডাকাত লাটুর সম্পত্তি খুঁজতে এসে সাক্ষাৎ ডাকাতই এসে জালে ধরা দিল।

বাবা বললেন, আর তাদের চোরাই সোনা সব সরকারের দপ্তরে গেল, সেটা বলবে না?

কাকাবাবুর হাসি আরও বাড়ল।

হাসির মধ্যেও কিন্তু একটা নিরানন্দের সুর মিশে ছিল। হ্যারিকেনের আলোতেও বোঝা যাচ্ছিল, কাকীমার মুখ ম্লান। শুক বলল, কাকীমা, তুমি হাসছ না!

—শম্ভুদার কথা ভাবছি রে শুক! কোথায় যে গেল!

কাকাবাবু বললেন, এটাই ট্র্যাজেডী। শম্ভুদা যে কেন পালাল! ওকে তো আর অ্যারেস্ট করা হত না। বেচারা!

বাবা বললেন, বেচারা বলছ কেন? ছেলে যার ডাকাত, সে আবার বেচারা কোথায়!

—শম্ভুদা লোকটা ভাল। হয়ত এ সব পছন্দ করত না। একদিন তো আমিই শুনেছি! না জানি আরও কতদিন নিষেধ করেছে। কিন্তু ছেলে যদি—

—সে ছেলেকে ধরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

পিতৃস্নেহ।—কাকাবাবু বললেন, আমাদের ছেলে নেই, তবু আমরা বুঝি।

চুপচাপ সকলে বসে। বাইরে রাত্রি বাড়ছে। চারিদিক আশ্চর্য নিশ্চুপ। একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর সারা গাঁ যেন পাথর।

শুকের নিজের সেই নদীর ধারে একটা লোকের সঙ্গে দেখা, তারপর তাকে জিজ্ঞাসা এবং গোপন করতে বলা, গোপন না করলে লোপাট করে দেবার ভয় দেখান—প্রকাশ করতে লজ্জা লাগছে। ওটা অন্ধকারেই থাক। নইলে সবাই তাকে ভীতু ভাববে। ভাববে, লোপাট হবার ভয়েই সে গোপন করে গিয়েছিল সেদিন।

কিন্তু এমন চমৎকার ব্যাপারটাও শুধুমাত্র শম্ভুদার জন্যেই যেন কী রকম লাগছে! শুক এ কাহিনীটা কোথাও বলতে গেলে জানে, শম্ভুদার কথাতে এসে তার বুকে একটা ব্যথা নিশ্চিতই জেগে উঠবে।

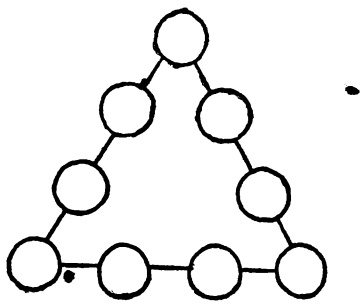

হিন্দু কলেজ ছিল সেকালে কলকাতার একটি বিখ্যাত ও উন্নত ধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। সেখানে পড়বার সুযোগ পেলে ছাত্ররা গর্ব অনুভব করতো। সেকালের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিই ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র।

বিশ্বনাথ তর্কভূষণের ছেলে ভূদেবের মনে ভয়ানক আকাঙ্খা জাগলো, সে হিন্দু কলেজে পড়বে। কিন্তু পিতা দরিদ্র ব্রাহ্মণ—অতি কষ্টে তাঁর সংসার চলে। তিনি কিভাবে ছেলেকে হিন্দু কলেজে পড়াবেন? তখন হিন্দু কলেজের মাসিক বেতন ছিল পাঁচ টাকা—অন্যান্য কলেজের চেয়ে অনেক বেশি।

ভূদেব লেখাপড়ায় বরাবরই খুব ভালো। টাকার অভাবে সে ভালো শিক্ষালয়ে পড়তে পারবে না, একথা ভেবে পিতা বিশ্বনাথ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এমন সময় এক ভদ্রলোক প্রতিশ্রুতি দিলেন, মাসিক পাঁচ টাকা সাহায্য করবেন ভূদেবচন্দ্রকে। সেই ভরসায় বিশ্বনাথ ছেলেকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু কয়েকমাস পরেই দেখা গেল ভদ্রলোক প্রতিশ্রুতি পালন করছেন না। ফলে কলেজের মাইনে বাকী পড়তে লাগলো।

সহপাঠীর কাছ থেকে এই সাহায্য নিতে ভূদেবের মন চাইল না। সে বললো, না ভাই, দরকার নেই। আমি নিজে চেষ্টা করে এই টাকা যোগাড় করবো।

টাকা কিন্তু যোগাড় হলো না। অবশেষে মন শক্ত করে ভূদেব অধ্যক্ষের কাছে তার মনের কথা প্রকাশ করলো। প্রার্থনা জানালো যে, পরীক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত যেন তার নাম কেটে না দেওয়া হয়।

অনেক অনুরোধ করার পর অধ্যক্ষ রাজী হলেন। ভূদেব পরীক্ষা দিল। পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে সে একেবারে পঞ্চম শ্রেণীতে গিয়ে উঠলো। বৃত্তি পেল সত্যি সত্যি। বৃত্তির টাকা থেকে কলেজের মাইনে শোধ হয়ে গেল।

কলেজের পড়া একদিন শেষ হলো। পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি পাওয়াও শেষ হয়ে গেল। আবার ভূদেব পড়লো অর্থের অনটনের মধ্যে। এবার কলেজ নয়, বাড়িতে।

ভূদেব বেরুলো চাকরির সন্ধানে। কলকাতার অফিসে অফিসে চাকরির জন্য ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু চাকরি জুটলো না।

এমনি করে মাসের পর মাস চলে যায়, চাকরি আর

মহাজীবনের গল্প • দুঃখজয়ী তরুণ • রবিদাস সাহারায়

কলেজের অধ্যাপকরা ভূদেবকে ভালবাসতেন। কারণ তাঁর মত মেধাবী ছেলে খুবই কম ছিল। তাই প্রথম দিকে মাইনে বাকী পড়লেও খুব অসুবিধা হয়নি। কিন্তু এমনি করে যখন ষোল মাসের মাইনে বাকী পড়ে গেল, তখন আর অধ্যাপকদের কিছু করবার রইল না। ইংরেজ অধ্যক্ষ ভূদেবকে ডেকে জানালেন—সব টাকা শোধ না করলে কলেজ থেকে তার নাম কেটে দেওয়া হবে।

ভূদেব বিষম সমস্যায় পড়ে গেল। আশি টাকা সে জোগাড় করবে কোত্থেকে? অথচ তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস: পরীক্ষা দিতে পারলে চল্লিশ টাকা বৃত্তি সে পাবেই।

একদিন কলেজের মাঠের এক কোণে বসে ভূদেব সেই কথাই ভাবছে। হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হলো তার এক সহপাঠী, বড়লোকের ছেলে।

মধুসূদন দত্ত জিজ্ঞেস করলো—কি রে, এখানে বসে বসে এত কী ভাবছিস?

ভূদেব তার দুঃখের কথা মধুসূদনকে জানালো। মধুসূদন বললো—যদি কিছু মনে না করিস, এ টাকাটা আমি তোকে দিতে পারি।

জোটে না। হিন্দু কলেজের সেরা ছেলে, সিনিয়র স্কলার—তার ভাগ্যে এমন দুর্গতি!

সারাদিন ঘুরে ঘুরে একদিন বাড়ি এসে ভূদেব শুনলো—সংসারের অচল অবস্থার কথা নিয়ে আলোচনা করছেন তার মা আর বাবা। বাবা বলছেন—কী কুক্ষণেই ছেলের কথায় তাকে ইংরেজী পড়াতে গিয়েছিলাম! ঘরে একমুঠো চাল নেই, আর ছেলে আমার ডেপুটির চাকরির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কথাগুলো ভূদেবের মনে তীরের মত গিয়ে বিঁধলো। সে আর বাড়িতে ঢুকলো না। সোজা পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলো। কাছে একটি পয়সা নেই। হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছলো সে চুঁচড়ায়। দিন গড়িয়ে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। খিদেয় তখন পেট জ্বলছে—হাঁটবার ক্ষমতাও আসছে কমে। পরিশ্রান্ত হয়ে একটি বড় বাড়ির রোয়াকে বসে পড়লো সে।

সন্ধ্যার পর সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। তিনি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলেন তরুণটিকে। তরুণের সেই মূর্তি দেখে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি অমন করে বসে আছ কেন বাপু?

ভূদেব জানালো—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একদানা অন্নও তার পেটে পড়েনি।

বৃদ্ধ ভূদেবকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে আদর করে খেতে দিলেন। বড়লোকের বাড়ি। অনেক রকম উপাদেয় খাবার এনে দেওয়া হলো তার সামনে। কিন্তু সেসব খাবার দেখে কেঁদে উঠলো ভূদেবের মন। বাড়িতে তার মা বাবা আধপেটা খেয়ে আছেন। সে কেমন করে এসব খাবার মুখে দেবে?

ভূদেবের কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে এবং তার পড়াশোনার কথা শুনে বৃদ্ধ সেদিনই তাকে তাঁর বাড়ির গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন।

এই ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বড় হয়ে অনেক বড় চাকরি পেয়েছিলেন। তিনি যখন চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন, তখন সেই সময়ে বাংলাদেশের শিক্ষা বিভাগে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় প্রথম বাঙালী কর্মচারী। তাঁর বেতন ছিল পনেরো শ টাকা।

অথচ কী দুঃখের সঙ্গে লড়াই করেই না তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন!

আর একটি ছেলের কথা মনে পড়ে। পৃথিবীতে এমন দুর্ভাগ্য নিয়ে বোধ হয় কম ছেলেই জন্মায়। নাম তার বুকার টি ওয়াশিংটন। ক্রীতদাস নিগ্রোদের ঘরে তার জন্ম। কুকুর-বেড়াল মানুষের কাছে যতটুকু ভালবাসা বা সহানুভূতি পায়, সেই সময় নিগ্রোরা সাদা মানুষদের কাছে তাও পেত না। অথচ ওয়াশিংটনের মনে কত আশা! সে সাদা ছেলেদের মত লেখাপড়া শিখবে এবং শুধু তাই নয়, তার জাতের লোকদেরও শিক্ষিত করে তুলবে।

এক খ্রীস্টান পরিবারে সে একটি চাকরি পেয়ে গেল। মনিবের ছেলেমেয়েদের রোজ স্কুলে পৌঁছে দেওয়া ছিল তার একটি প্রধান কাজ। স্কুলের ভিতরে ঢোকবার তার অধিকার ছিল না। দরজার সামনে ছেলেমেয়েদের ছেড়ে দিত। সেখানে দাঁড়িয়ে সে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকতো ভিতরের দিকে। মনে মনে ভাবতো, ঐ চৌকাঠটুকু পার হবার অধিকার কি কোন দিন সে পাবে না?

রাত্রিতে লুকিয়ে লুকিয়ে সে নিজেই পড়াশোনা করতো। একদিন সে স্থির করলো, হ্যাম্পটন শহরের স্কুলে ভর্তি হবে। কিন্তু কিভাবে হবে? কে-ই বা তাকে ভর্তি করিয়ে দেবে? তাছাড়া কোন নিয়মকানুনই যে তার জানা নেই!

বুকার টি ওয়াশিংটন একদিন পায়ে হেঁটে রওনা হলো। তখন তার বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত অবস্থায় সে হ্যাম্পটন স্কুলের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলো। দেখলো, ভর্তি হবার জন্য ছেলেদের সেখানে ভিড় জমে গেছে। হতাশ হয়ে বারান্দার এককোণে বসে পড়লো সে।

ছেলেদের পরীক্ষা নিয়ে ভর্তি করা হচ্ছে। বেলা ক্রমেই বাড়তে লাগলো। ধীরে ধীরে এক-এক করে সব ছেলেই চলে গেল। রইলো শুধু সেই নিগ্রো ছেলেটি। তাকে কেউ ডাকলো না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তখন সে ভয়ানক কাতর হয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ পর একজন শিক্ষয়িত্রী বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেলেন এই ছেলেটিকে। জিজ্ঞেস করলেন—কী চাই তোমার?

ছেলেটি জবাব দিল—আমি এই স্কুলে ভর্তি হতে চাই।

শিক্ষয়িত্রী তার দিকে তাকিয়ে একটু বিদ্রূপের হাসি হাসলেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন, ছেলেটি সারাদিন অভুক্ত। তাই বললেন—এই ঘরটাতে বড় ধুলো হয়েছে, পরিষ্কার করে দিস তো খেতে পাবি।

একটা ঝাঁটা হাতে নিয়ে ছেলেটি তখনই কাজে লেগে গেল। কিছুক্ষণ পরে শিক্ষয়িত্রী এসে দেখলেন, ঘরটির চেহারা পালটে গেছে—ঝকঝক তকতক করছে ঘরটি।

শিক্ষয়িত্রী তাকে খাবার জন্য পয়সা দিতে চাইলেন, কিন্তু ওয়াশিংটন তা নিল না। বললো—আমি খেতে চাই না, আমি স্কুলে ভর্তি হতে চাই।

কী গভীর নিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয়ের ছবিই না শিক্ষয়িত্রী দেখতে পেলেন ছেলেটির চোখে মুখে! তিনি বললেন—তোকে পরীক্ষা নেওয়া হবে। পারবি পরীক্ষা দিতে?

হ্যাঁ পারবো।—দৃঢ়কণ্ঠে ওয়াশিংটন বললো।

দু-একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে শিক্ষয়িত্রী সত্যি অবাক হয়ে গেলেন। ওয়াশিংটনকে স্কুলে ভর্তি হবার ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি।

সেই অনাদৃত বুকার টি ওয়াশিংটন জীবনে উন্নতির কোন্ সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন তা পৃথিবীর কারো অজানা নেই। আমেরিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি পাবার পর তিনি সংকল্প করেন যে, অশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন তাঁর জাতিকে শিক্ষার আলোক দান করবেন। সেই কাজ তাঁর প্রচেষ্টাতেই সার্থক হয়েছিল।

ওয়াশিংটনকে নিগ্রোজাতির মুক্তিদাতা বললেও ভুল হয় না।

ম্যান অব দি ম্যাচ

অরুণ আইনের সম্পূর্ণ উপন্যাস

ছোট্ট সুন্দর ফুটফুটে একটি মেয়ে, হাতে তার ছোট্ট একটি প্রদীপ। তিরতির করে জ্বলছে সেই মাটির প্রদীপ। ভারত মহাসাগরের এক নির্জন তটে সেই প্রদীপ আঁচলে ঢেকে ছোট্ট মেয়েটি চলেছে পায়ে-পায়ে নূপুর বাজিয়ে ঝমঝম করে। চরাচরে সন্ধ্যার নরম অন্ধকার।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে যদি ভারত মহাসাগরের গভীর অন্তস্তলে প্রচণ্ড নিম্নচাপের ফলে জন্ম নেয় এক ভয়াবহ ঘূর্ণি হ্যারিকেন, আর সেই হ্যারিকেন গুমরাতে গুমরাতে যদি এসে আছড়ে পড়ে তীরে, তবে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়? কোথায় সেই আধো সন্ধ্যার আধো অন্ধকার আর কোথায় সেই মিষ্টি মুখের ছোট্ট মেয়েটি আর কোথায়ই বা তার হাতের ছোট্ট প্রদীপ! মুহূর্তে সব লণ্ডভণ্ড করে আছাড়ি-বিছাড়ি খেয়ে প্রচণ্ড হাহাকার তুলে কোথায় যেন চলে গেল সেই ঝড়।

ঝড় থামলে দেখা গেল, আকাশে ফুটফুটে চাঁদ উঠেছে, বেলাভূমি শান্ত, নিশ্চুপ। চারদিক অদ্ভুত তকতকে ঝকঝকে। কিন্তু কোথায় সেই ছোট্ট প্রদীপের আলোটুকু আর কোথায় সেই প্রদীপবাহিকা ছোট্ট মেয়েটি!

ব্যাঙ্গালোরে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেস্টে ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটে গেল। ভারতীয় ব্যাটিং-এর উপর অ্যাণ্ডি রবার্টসের বোলিং আর ভারতীয় বোলিং-ফিল্ডিং-এর উপর ক্লাইভ লয়েডের ব্যাটিং যেন ভারত মহাসাগরের প্রচণ্ড নিম্নচাপজনিত ঘূর্ণাবর্তের মত এসে পড়ল। লয়েড একটা আকাশ-ছোঁয়া দানবের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ভারতের বোলারদের ফিল্ডারদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে চারিদিকে অন্ধকার-ডাকা ঝড় তুলে ফেললেন।

ঝড় থামতে লোকে দেখল, চারদিক শান্ত, নিস্তব্ধ। চারদিক অদ্ভুত ঝকঝকে তকতকে। কিন্তু ভারতীয় দলের প্রদীপবাহক অধিনায়ক মনসুর আলি খাঁ পাতৌদিকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্টে তিনি অবসর নিলেন।

শুরু হল দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ রাজধানী দিল্লীতে। এবার অধিনায়ক দক্ষিণ ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন স্পিনার ভেঙ্কটরাঘবন।

পাঁচ দিনের জায়গায় খেলা শেষ হল চার দিনে। আরো বিশ্রীভাবে হেরে গেল ভারতীয় দল। পাঁচটি টেস্ট সিরিজের প্রথম দুটিতেই ভারত হেরে রইল ২-০ ম্যাচে।

ধন্য আশা কুহকিনী! এই রকম একটা বহুল-প্রচারিত কথা শোনা ছিল না? কিন্তু কী হতভাগ্য, কী ব্যর্থ এই ভারতীয় দল! তার সম্বন্ধে অতিবড় স্বপ্নবিলাসী মানুষও আর আশার কুহকী ছলনায় ভুলে পা বাড়াচ্ছে না। কলকাতায় তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ শুরু হবার আগেই লোকে জেনে গেছে, ভারত এবার হারছে আরো শোচনীয়-ভাবে। পাঁচ দিনের জায়গায় তিন দিনেই খেলা শেষ হয়ে যাবে। এ বিষয়ে শ্যামবাজারের রকের আড্ডার ক্রিকেট-বিশেষজ্ঞ ভ্যাটাদা থেকে শুরু করে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ-সাংবাদিকরা পর্যন্ত একমত।

তৃতীয় টেস্টে আবার আশায় বুক বেঁধে ফিরে এলেন অধিনায়ক পাতৌদি। অধৈর্য বিরক্তিতে অনেককে কটূক্তি করতেও শোনা গেল তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু থাক সে সব কথা।

কলকাতা, ২৭শে ডিসেম্বর, শুক্রবার, ১৯৭৪ সাল। শুরু হল ইডেনের বুকে ঐতিহাসিক ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ। গ্যালারীতে গ্যালারীতে উপচে পড়ছে সত্তর হাজার সাক্ষী। না, দুটি দলের টেস্ট ম্যাচ দেখতে তারা আসেনি, এসেছে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের এগারোটা দপদপে স্বাস্থ্যবান নেপোলিয়নী ঘোড়ার দামামা শুনতে।

২৭শে ডিসেম্বর, সকাল দশটা পনেরো। প্যাভিলিয়ান প্রান্তে দেখা গেল দুজন মানুষকে মাঠের ভেতর বেরিয়ে আসতে। সত্তর হাজার দর্শক, সাংবাদিক, ভাষ্যকার, টেলিভিশন-ক্যামেরা-চালক মুহূর্তে জেনে নিল, লম্বা ছিপছিপে স্বাস্থ্যবান চেহারার যে মানুষটি দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছেন মাঠে, তিনিই হলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সেই অবিসংবাদী দানবীয় সেনাপতি স্বয়ং ক্যাপ্টেন ক্লাইভ লয়েড। কিন্তু তাঁর পাশে-পাশে যে মানুষটি মাঠে ঢুকছেন, তিনি কে? কে তিনি—পাশাপাশি যাঁর পদক্ষেপ যেন একটু ক্লিন্ন, একটু ক্লান্ত, মর্যাদায় একটু আড়ষ্ট? তাই কি? চোখের ভুল নয় ত? ইডেন মুহূর্তে চিনে নিল তাঁকে,

উনিই ভারতীয় দলের ফিরে-আসা নায়ক স্বয়ং নবাব মনসুর আলী খাঁ পাতৌদি।

টস হল। পাতৌদি হাত তুললেন। ইডেনে সামান্য সাড়া পড়ল। কিন্তু শুধু সাড়াই উত্তেজনা নয়। কারণ, টসে জিতে প্রথম ব্যাটিং করার যে সুবিধা তা ভারতীয়রা কখনই নিতে পারবে না ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বোলিং স্টীম রোলারের বিরুদ্ধে।

আর প্রমাণিতও হল তা-ই অক্ষরে অক্ষরে! ইডেনে টসে জেতার সুযোগটুকু নিতে পারল না ভারতীয় ব্যাটস-ম্যানেরা। পারবে কী করে? গত দুটো টেস্টে এদের মেরুদণ্ড যে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল! সামান্য ২৩৩ রানে শেষ হয়ে গেল ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস। আগের দুটি টেস্টের মত এ ইনিংসেও পুনরাবৃত্তি ঘটল ভারতীয়দের ভীরুতা আর কাপুরুষতার। পেস বলের জুজুর ভয়ে সবাই ক্রিকেটের প্রাথমিক প্রথা-প্রকরণটুকু অবধি ভুলে গেল যেন।

শুরু হল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস। এই প্রথম যেন ইডেন একটু নড়েচড়ে বসল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ২৪০ রানে শেষ। অবিশ্বাস্য! অসম্ভব! সামান্য ৭ রানে এগিয়ে রইল ওরা। কিন্তু তবু উত্তেজনা জাগল না কারো মনে। কারণ এটা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাটিং-দৈত্যের সাময়িক একটা অবসাদ বলেই ধরে নিল সবাই। দ্বিতীয় ইনিংসে আবার স্টীম রোলার চালাবে সে।

আর সে কথাই প্রমাণিত হল ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বোলিং আর ফিল্ডিং চরিত্রের মধ্যে দিয়ে।

২৯শে ডিসেম্বর, রবিবার। খেলার তৃতীয় দিন। শুরু হল ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস।

আশার নাম কুহকিনী। সেই কুহকিনীই যেন আবার ভর করতে চাইল ভারতীয় সমর্থকদের মনে। যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে ভারতীয় বোলাররা মাত্র ২৪০ রানে ফেলে দিয়ে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের নজির রেখেছে সেই অপ্রত্যাশিত সুযোগটুকু কি ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা দ্বিতীয় ইনিংসেও নেবে না?

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল মাঠে নামল। আম্পায়ার দুজন আগেই মাঠে এসে পড়েছেন। সমস্ত মাঠ থমথম করছে। প্যাভেলিয়ানপ্রান্তে দেখা গেল ভারতীয় দলের খেলোয়াড়কে। ফারুক ইঞ্জিনীয়ার আর সুধীর নায়েক। আসছে ওরা ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ভিত গড়তে। ধীর স্থির পদক্ষেপ দুজনের। মুখে সঙ্কল্পের অটুট বর্ম।

অধিনায়ক লয়েড বল তুলে দিলেন সুযোগ্য সহযোদ্ধা রবার্টসের হাতে। ব্যাট হাতে স্টান্স নিয়ে দাঁড়াল ইঞ্জিনীয়ার।

রবার্টস বল হাতে দৌড়ের জায়গায় এসে দাঁড়াল।

দৌড় শুরু করল রবার্ট।

ফেটে পড়ছে উত্তেজনায় ইডেন।

কামানের গোলার মত নতুন বল ডান দিকের স্ট্যাম্প লক্ষ্য করে উড়ে এলো। স্বভাব-চঞ্চল ইঞ্জিনীয়ার সবাইকে অবাক করে দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ঘাড় নামিয়ে সোজা ব্যাটে বল রুখে দিল।

ইডেনে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল!

কিন্তু তিন ওভার যেতে না যেতেই ইডেন বুঝে নিল, আশার নাম সত্যিই কুহকিনী।

রবার্টসের বলে ফ্রেডরিক ছোঁ মেরে তুলে নিল ভারতীয় দলের অপর গোড়াপত্তনকারী সুধীর নায়েককে। তার রান সংখ্যা তখন ৬। ভারতীয় দলের ১৯। ১৯ রানে প্রথম উইকেট ভারতীয় দলের অন্ধ সমর্থকেরও চোখে আঙুল ঢুকিয়ে বুঝিয়ে দিল খেলা কোন্ অবধারিত যবনিকার দিকে এগোচ্ছে।

প্যাভেলিয়ানপ্রান্তে এবার দেখা গেল ভারতীয় দলের ওয়ান ডাউন ব্যাটসম্যান পার্থসারথী শর্মাকে। ওয়ান ডাউন ব্যাটসম্যান সাধারণত দলের শ্রেষ্ঠ ব্যাটস-ম্যান। দলের বনিয়াদ গড়ে দেয় সে-ই। তরুণ পার্থসারথী ভারতীয় দলের সাড়া-জাগান নাম। দেশের মাটিতে অনেক ভালো খেলার নজীর রেখে ভারতীয় দলে এসেছে সে। এই সংকটমুহূর্তে এই তরুণের কাছে অনেক কিছু আশা করে ইডেন।

কিন্তু কী দায়িত্বহীন, কী দ্বিধাগ্রস্ত খেলা তার!

ইঞ্জিনীয়ারকে ক বার রান আউট করাতে করাতে সে নিজেই মাত্র ৯ রানে রান আউট হয়ে প্যাভেলিয়ানে ফিরে গেল। বোঝা গেল, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ক্ষুরধার আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মনোবল সে সংগ্রহ করতে পারেনি। কিন্তু পারবে কি আর কেউ? আর কে আছে ভারতীয় দলে তেমন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান? পাতৌদি ত ইদানীং তেমন রান পাচ্ছেন না। আছে অংশুমান গাইকোয়াড়। কিন্তু সে ত অনভিজ্ঞ তরুণ। তার কাছে বড় কিছু অঘটন আশা করে না কেউই। বিশ্বনাথ? ছেলেটি প্রতিভাবান। প্রথম আবির্ভাবেই কানপুরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী করে সাড়া জাগিয়েছিল সে। কিন্তু ইদানীং তাকেও ৩০।৩৫ এর গণ্ডি পেরুতে দেখেনি কেউ। করলে বড়জোর গোটা ৫০ রান করতে পারে সে। কিন্তু তাতে কী হবে? ১৫০ রাণেই যে শেষ হয়ে যাবে দ্বিতীয় ইনিংস!

দুই উইকেটে মাত্র ৪৬ রান।

ইডেনে তখন কবরের হিম-স্তব্ধতা।

উইকেটে এখনও আছে ইঞ্জিনীয়ার। কিন্তু তার কাছে বড় একটা কিছু কেউ আশা করে না। ব্যাট করতে নেমে বড় চঞ্চল, বড় অসাবধানী সে। এই ধরনের সংকটমুহূর্তে যে অবিচলতা বাঞ্ছনীয়, সেটুকু তার চরিত্রে নেই। সবাই আশা করল, এবার স্বয়ং অধিনায়ক পাতৌদি মাঠে নামবেন, এই সংকটমুহূর্তে অধিনায়কোচিত ব্যাট করে, দলকে সংকট থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবেন তিনি।

কিন্তু ও কি! প্যাভেলিয়ানপ্রান্তে ও কাকে দেখা যাচ্ছে ব্যাটহাতে?

ইডেন চমকে উঠল।

কালো রঙের ছোট্ট বেঁটে একটি ছেলে।

গ্যালারী চিনল একে। কর্নাটকের এ সেই মধ্যম স্বাস্থের ছেলেটি গত কয়েকটি সিরিজে যে কখনো ৫০ রানও অতিক্রম করতে পারেনি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘাড় নীচু করে বসে রইল ইডেন।

কিন্তু তারপর? কী হল তারপর?

ছেলেটি এল ব্যাট হাতে।

সামনে তখন হোল্ডার, আণ্ডি রবার্টস, জুলিয়েনের দল জয়ের গন্ধ পেয়ে বলহাতে পাশব জিগীষায় লাফাচ্ছে।

মধ্যাহ্নের সূর্য, তুমি সাক্ষী। সাক্ষী সত্তর দুগুণে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার অশ্রুভেজা চোখ। চোখ নও, তুমি ফুল, পুজোর ফুল হয়ে ফুটে তুমি দেখছ এক অসাধারণ অসম লড়াই।

দক্ষিণায়নের সূর্য যত এগিয়েছে, একধারের মাটির ভেতরে ছেলেটির পা যেন তত দীর্ঘ হয়ে নেমে গেছে। আর অসহায় চোখে ছেলেটি দেখেছে পাতৌদির মাত্র ৮ রানে ফিরে যাওয়া। এলো অংশুমান, মাত্র চার রানে সেও আউট। এলো মদনলাল! এইভাবে একজনের চোখের সামনে ভেসে থেকেছে শুধু আসা আর যাওয়া। ছোট্ট বেঁটে ছেলেটি শুধু দেখেছে একে একে মহান রথী-মহারথীদের ব্যাট হাতে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ।

অথচ ওই ব্যাট সেই ছেলেটির হাতে তখন আর শুধু ব্যাট নেই। কখন যেন তা পাল্টে গেছে এক আশ্চর্য মায়াবী যাদুদণ্ডে। গিবসের স্পিনের হিংস্র নিঃশ্বাস, রবার্টসের পেসের ক্রুদ্ধ ছোবল তখন সেই যাদুদণ্ডের স্পর্শে মাথা নিচু করে তার পায়ের নিচে গড়িয়ে পড়ছে।

ভারতীয় ক্রিকেটের এক কালরাত্রি ২৯শে ডিসেম্বর! কিন্তু সব কালরাত্রিই, তা যত ভয়ঙ্করই হোক, এক সময় শেষ হয়।

শেষ হল ২৯শে ডিসেম্বর।

কিন্তু চমকে উঠল গ্যালারী: এ কি!

দিনের নট আউট ব্যাটসম্যান ৫ রানে অপরাজিত ঘাউড়ীর সাথে মাথা নামিয়ে নম্র ভঙ্গিতে কে ফিরে যাচ্ছে ঐ আর একজন, দীর্ঘ চার ঘণ্টা লড়েও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দৈত্য যাকে কাত করতে পারল না! অপরাজিত, অলৌকিক ৭৫ রান স্কোর বোর্ডে এঁকে দিয়ে সেই আর একজন তখন ধীর নম্র পায়ে সহযোগী ঘাউড়ীর সাথে দিনের শেষে ফিরে চলেছে শিবিরে। যেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে উঠে এসে—

'একা কুন্ত রক্ষা করে নকল বুঁদির গড়।'

তৃতীয় দিনের শেষে খেলার অবস্থা তখন দাঁড়াল ভারতের ছয় উইকেটে ২০৬ রান। হার অবধারিত।

ঘাউড়ী যত ভালোই খেলুক সে আসলে একজন বোলার। ও আর কতক্ষণ লড়বে! এর পর দেখা দেবে ভারতীয় দলের সেই দীর্ঘ পুচ্ছটি—বেদী প্রসন্ন আর চন্দ্রশেখর, যারা আসবে আর যাবে।

বিশেষজ্ঞরা রায় দিলেন, ভারত যদি চতুর্থ দিনে আরো ১০০ রান করতে পারে, তবে জেতার একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে। কারণ পঞ্চম দিনের উইকেটে ভারতীয় স্পিনারদের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৩০০ রান করা খুব সহজ হবে না।

আরো ১০০ রান! অসম্ভব! অতিবড় স্বপ্নবিলাসীরও সংখ্যাটা ভাবতে বুক কেঁপে উঠল দুরদুর করে।

কেন, ওই ছেলেটি, যে ৭৫ রানে নট আউট, সে ত এখনও আছে ক্রিজে!

দূর, দূর! একদিনের বিরতির পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বোলিং-রোলার নবউদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর উপর। তখন ওর সাধ্য কী আর দাঁড়ায়!

বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। তাই ৩৫-এর বেড়া ডিঙিয়ে এবার ৭৫ করেছে। তাই বলে অত বড় আশা কেউ করে না ওর উপর যে, সে দায়িত্ব নিয়ে ভারতীয় দলকে চতুর্থ দিনে ৩০০ রানের বেড়াজাল টপকে দেবে।

৩০শে ডিসেম্বর বিরতি।

৩১শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার। আবার ইডেনে যবনিকা উঠল। গ্যালারীতে গ্যালারীতে আবার সেই সত্তর হাজার উপচে পড়া দর্শক। ভারতীয় ইনিংসের বাকী-টুকু কিভাবে গুঁড়ো হয়ে যায় সেই প্রতীক্ষায় তারা অপেক্ষমান।

লয়েড তাঁর টিম নিয়ে নেমে পড়লেন মাঠে। দুজন আম্পায়ারও এসে যথারীতি জায়গা নিয়েছেন।

পীচে রোলার পড়ে গেছে।

পিন পড়লেও শব্দ হয়।

শুরু হবে ভারতীয় দলের অসমাপ্ত দ্বিতীয় ইনিংস। আর মোটে ১০০টা রান। ১০০টা রান মোটে। এই-টুকু করার কেউ নেই আজ ভারতীয় দলে! করলে অন্তত ভারতীয় স্পিনাররা একবার কপাল ঠুকে দেখতে পারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে।

ভারতীয় শিবিরে তখন ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবির নৈঃশব্দ্য। বেয়ারা কানাই একগ্লাস জল দিয়ে গেল সোলকারকে।

ঘাউড়ী প্রস্তুত। ব্যাটহাতে অপেক্ষা করছে সেই ছেলেটার তৈরী হওয়ার জন্যে।

ছেলেটি ঝুঁকে পড়েছে তার পায়ের উপর। বুটের ফিতে বাঁধতে গিয়ে-টের পেল, ডান হাত সামান্য কাঁপছে। পাশে প্রসন্ন। ওপাশে ইঞ্জিনীয়ার বসে আছে গোমড়া মুখে।

হঠাৎ কার যেন চাপা ছটফটানি শোনা গেল—'ইস, আর যদি ১০০টা রানের লীড পেতাম!'

চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে সবাই দেখল, ভাগবৎ চন্দ্রশেখর চেয়ারে বসে হাত কামড়াচ্ছে। সবাইকে ওর দিকে ফিরে তাকাতে দেখে চন্দ্র একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সামান্য হাসার চেষ্টা করল। হাসতে পারল না।

বুট বাঁধা হয়ে গেছে। ছেলেটি এবার উঠে দাঁড়াবে। চোখ তুলতেই চোখাচোখি হয়ে গেল আসনে বসা অধিনায়ক পাতৌদির সঙ্গে। করুণ, বিধ্বস্ত, আশাহত একজন সেনাপতি।

পাতৌদি কী বুঝলেন কে জানে, বিড়বিড় করে বললেন, 'ওয়েল ডান মাই বয়। তুমি যথেষ্ট করেছ।'

ম্যানেজার রামচাঁদ থমথমে মুখে ঘরে ঢুকলেন—'তোমরা বেরিয়ে পড়।'

এই শোন্, তুই আর ১০০টা রান এনে দিতে পারবি না? পারলে এই এগারোটা মৃত ঘোড়াকে তুই আবার ফিরিয়ে দিতে পারবি ওদের প্রাণ। শুধু এগারোটা ঘোড়া নয়, এগারো কোটি লোক চেয়ে আছে আজ ইডেনের দিকে। তোরা শুধু হারবি। হারবিই শুধু। জিতবি না একবারও। জেত্ না একবার! আরো ১০০টা রান এনে দে।

কে যেন ছেলেটির কানে কানে এই কথাগুলি বিড়-বিড় করছিল।

ছেলেটি চকিতে ঘুরে দাঁড়াল। ডান হাত বাড়িয়ে দিল ব্যাটের দিকে। টের পেল, ওর হাত আর তখন

একটুও কাঁপছে না। তারপর গট গট করে বেরিয়ে গেল গ্রীনরুম ছেড়ে।

শুরু হল চতুর্থ দিনের খেলা।

ময়দানপ্রান্ত থেকে ছুটে আসছে জুলিয়েন। ব্যাট হাতে তৈরী ছেলেটা। গত পরশু ৭৫ রানে নট আউট সে।

আস্তে আস্তে ছুটে আসতে আসতে হঠাৎ প্রচণ্ড গতি-বেগ বাড়িয়ে এবার ছুটে আসছে জুলিয়েন।

ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে সেই ছোট্ট কালো বেঁটে ছেলেটি।

পারবি না, পারবি না তুই। ওই দেখ্, দৈত্যটা তোকে গুঁড়ো করে দিতে আসছে।

এত সহজ! তোকে তুলে ফেলা এত সহজ!

ওই দেখ্, বাঁদিক ঘেঁষে আসছে বল। বাতাসে কাটছে। ভালো গ্ল্যান্স আসে তোর।

—গ্ল্যান্স করি?

—না, না, মাথা খারাপ তোর! এখন গ্ল্যান্স! এসেই কেউ গ্ল্যান্স করে?

—কেন, কী হয়েছে? ৭৫ রান ত করেছি। এখন ঝুঁকি নিলে কী ক্ষতি? পরের টেস্টে চান্স ত বাঁধা।

—ছিঃ ছিঃ, একথা বলতে পারলি তুই! এত নীচ তুই! তুই শুধু তোর দিকটা দেখলি। গোমড়ামুখে ইঞ্জিনীয়ারকে মনে পড়ছে না তোর?

—পড়ছে।

—হাত কামড়ান চন্দ্রকে?

—পড়ছে।

—করুণ সেনাপতি তোর ক্যাপ্টেনকে?

—পড়ছে।

—দেশ?

—হুঁ।

—তবে?

বাঁদিক ঘেঁষে আসা বল গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ প্যাডআপ করে ছেড়ে দিল।

এরকম একটা সহজ লোভনীয় বল পেয়েও বিশ্বনাথ গ্ল্যান্স করল না।

মারে বল তুলে ফেরত দিল জুলিয়েনকে।

পরের বল।

ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছে এবার সে।

বাম্পার! বাম্পার!

বিশ্বনাথ ডাক্ করে বল ছেড়ে দিল।

মারে, কালীচরণ, ফ্রেডারিক্স মারফৎ বল ফেরত গেল জুলিয়েনের হাতে।

—তোকে বাম্পার দিচ্ছে রে!

—হুক্ করতে পারতাম।

—জানি। আর একটু অপেক্ষা কর্। পরে থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিস।

জুলিয়েনের পর হাইকোর্টপ্রান্ত থেকে এল রবার্টস। ব্যাট করবে ঘাউড়ী।

পিচের মাঝামাঝি দুজনের দেখা। ঘাউড়ীর মুখে আলতো হাসি। হাসিটা বড় মিষ্টি লাগল বিশ্বনাথের।

আমি আছি। তুমি চিন্তা করো না।—বিশ্বনাথকে নিশ্চিন্ত করল ঘাউড়ী।

পারবি?—বিশ্বনাথ প্রশ্ন করল।

ঘাউড়ী আবার সেই মিষ্টি হাসিটা হাসল—থাকছিই। তুমি অন্যদিকে স্কোরবোর্ড ঘুরিয়ে যাও।

গ্যালারীর সবাই জানল, অভিজ্ঞ বিশ্বনাথ তরুণ ঘাউড়ীকে কিছু উপদেশ দিল।

কথা রাখল ঘাউড়ী। ঘাড় নিচু করে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে একটা জেদী ঘোড়ার মত একটার পর একটা বল ঠেকিয়ে যেতে থাকল সে।

আর এক দিকে বিশ্বনাথ তখন সত্যি সত্যি স্কোরবোর্ড ঘুরিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বনাথ তখন বিশ্বনাথ—রুদ্রতেজে দীপ্যমান তখন সে! তার প্রতিভার তূণ থেকে তখন ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে চোখ-ঝলসানো সব মার—কাট্, লেট্‌কাট্, স্কোয়ারকাট্, সুইপ, গ্ল্যান্স, হুক, ড্রাইভ আর তার সবথেকে প্রিয় মার স্কোয়ার ড্রাইভ।

বিশ্বনাথের বিধ্বংসী রূপ তখন—ক্লাইভের মহান দুর্গ তখন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করছে সে! গ্যালারীতে গ্যালারীতে উড়ছে খুশীর বেলুন। মগ্ন শিল্পী বিশ্বনাথের হাতের ছোঁয়ায় এক-একটা বিদ্যুৎগতি চায় ভারতীয় ক্রিকেটের ঐশ্বর্যের এক-

একটা দুয়ার খুলে দিচ্ছে তখন। সেই ঐশ্বর্যের ধাঁধায় ক্লাইভের দলের চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বনাথ নব্বুই!

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ভি. আই. পি. বক্সে বসে খেলা দেখছেন। নিচের গ্যালারী থেকে ছেলেরা হৈচৈ করে উঠল—মানুদা।

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ঝুঁকে পড়লেন নীচে—কি রে?

বিশ্বনাথ সেঞ্চুরী করলে সন্দেশ চাই।—বাংলার ছেলেরা আবদার জানাল তাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।

আচ্ছা, আচ্ছা, হবে।—হাসতে হাসতে সে আবদার মেনে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

গ্যালারীতে গ্যালারীতে তখন খুশীর বেলুন আকাশ ছুঁয়েছে।

ল্যাঞ্চের তখন অনেকক্ষণ বাকী।

বিশালদেহী হোল্ডার বল করবে, বলে যার গতির সঙ্গে মেশানো থাকে সুইঙ-এর বিষ। গঙ্গা থেকে তখন বইছে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। কুশলী অধিনায়ক লয়েড সুযোগ বুঝে হোল্ডারের হাতে তুলে দিলেন বল। বাতাসে বল ভেঙে উইকেটে ঢুকে পড়তে পারে যে কোন সময়ে।

বেচারা হোল্ডার!

এ কোন্ অগ্ন্যুৎপাতের মুখে ঠেলে দিয়েছে তাকে তার ক্যাপ্টেন?

বল বাতাসে ভাঙা মাত্র একটা নিপুণ চোস্ত সুইপ। অনেকদিনের নিরলস সাধনার পর কোন জাত শিল্পীই শুধু এই পেলব লালিত্যটুকু করায়ত্ত করতে পারে। ব্যাটে বলে হওয়া মাত্র বিদ্যুৎগতিতে সীমানা পেরিয়ে চা—র!

ইডেনে যেন অ্যাটমবোম পড়ল!

অ্যাটমবোম পড়ার পর মুহূর্তের সেই গুমড়ানি। তারপরই ভেঙে পড়ল গ্যালারী, ভি. আই. পি. বক্স, প্রেস বক্স।

বিশ্বনাথের সেঞ্চুরী!

একশ রানের মধ্যে ১৬টি শুধু চার!

কপালে ফুটে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘাম মোছার জন্য ক্রিজ থেকে সরে দাঁড়াল বিশ্বনাথ। মাথা থেকে টুপি খুলতেই চোখে পড়ল, ওপ্রান্তে ব্যাট হাতে ঘাউড়ী। মুখে সেই মিষ্টি হাসিটা এবার আরো চওড়া হয়েছে।

বিশ্বনাথ মনে মনে বিড়বিড় করল—তোর কাছে কৃতজ্ঞ আমি।

ঘাউড়ী হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাল। বিশ্বনাথ ঘাড় নোয়াল।

—কি রে, খুশী ত?

কানের কাছে ফিরে এলো আবার সেই কণ্ঠস্বর, আজ সকাল থেকেই যেটা পেছনে লেগেছে।

—উহুঁ।

—সে কি রে! সেঞ্চুরী পেলি, খুশী নোস!

—সেই একশটা রান এখনও এনে দিতে পেরেছি কি?

কণ্ঠস্বরটা একটু থমকাল যেন। তারপর দারুণ খুশীর স্বরে বলল—চালিয়ে যা! আমি আছি।

আর ঠিক সেই সময় সত্তর হাজার উদ্বেল হৃদয়ের প্রতিনিধি হয়ে পুলিসের বেড়াজাল এড়িয়ে ছুটে মাঠে ঢুকে পড়ল একটি ছেলে। বিশ্বনাথকে জড়িয়ে ধরে ওর গালে এঁকে দিল সত্তর হাজার ঠোঁটের একটি উষ্ণ কৃতজ্ঞ চুম্বন।

আবার শুরু হল খেলা।

এর পর বিশ্বনাথকে আর রোখাই দায়। চাবুকের মত তার এক-একটা শট বাউণ্ডারীর দিকে বিদ্যুৎবেগে ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু অলৌকিক ক্যারিবিয়ান ফিল্ডিং। বহুদিন তাদের মনে রাখবে কলকাতা। প্রত্যেকটি অবধারিত চার তারা বুক দিয়ে ঠেকিয়ে দিল দুই আর তিনের পরিবর্তে।

ভি. আই. পি. বক্সের নীচে সেই ছেলেগুলিকে আবার বলতে শোনা গেল—মানুদা, আমাদের সন্দেশ কই?

কিছুক্ষণ পর উপর থেকে বৃষ্টিধারার মত পড়তে লাগল নলেন গুড়ের সন্দেশ।

সাবাস বিশ্বনাথ! তোমাকে ভুলছে না পশ্চিম বাংলা।

লাঞ্চের একটু পরেই ভারতের ইনিংস শেষ হল। রোম-বিজয়ী বীরের মত সম্বর্ধনা পেল বিশ্বনাথ, পেল তার অসাধারণ খেলার পুরস্কার। ১৩৯ রানে হোল্ডারের বলে আউট হল সে। আর ঘাউড়ীর অসাধারণ ধৈর্য্য আর

সংগ্রামের ইতিহাসটুকু লেখা রইল অমূল্য ২৭ রানের মধ্যে।

কথা রেখেছে বিশ্বনাথ। সেই দরকারী ১০০ রান সে নিজের কাঁধে দায়িত্ব তুলে করে দিয়ে গেল। ভারত ৩১৬ রানে ইনিংস শেষ করল। অর্থাৎ ৩০৯ রানে এগিয়ে রইল ভারত, যে ৩০৯ রান গতকাল বিশ্বের প্রথম-শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের মতে ছিল এক অসম্ভব স্বপ্ন। কিন্তু বিশ্বনাথ দেখিয়ে গেল, ভারতীয় ক্রিকেট গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়ালে এখনও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্বের সম্মানটুকু আদায় করে নিতে পারে।

বিশ্বনাথের সার্থক উত্তরসূরী বেদী, চন্দ্র আর প্রসন্ন। বিশ্বনাথের ব্যাটিং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল। সেই নুয়ে-পড়া শরীরটার উপর দিয়ে স্পিনাররা পঞ্চম দিনে স্টীম রোলার চালিয়ে দিল। এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস প্রত্যক্ষ করল সেদিন ইডেন।

চতুর্থ দিনের লাঞ্চের কিছুক্ষণ পর থেকে পঞ্চম দিনের লাঞ্চের ২ মিনিট আগেকার এই পাঁচ ঘন্টার মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটের গৌরবময় পুনরুত্থান ঘটল।

৩১০ রান করলে জিতবে এই অবস্থায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলতে নামল চতুর্থ দিন লাঞ্চের পর। কিন্তু মাত্র ২২৪ রানে ওরা অল আউট হয়ে গেল পঞ্চম দিনের লাঞ্চের ২ মিনিট আগেই।

১লা জানুয়ারী। ১৯৭৫। কাল সন্ধ্যা। স্থান হোটেল রিজ।

বাইরে বিশাল জনতা হৈহৈ করছে। নাচছে, গাইছে, ফুর্তির ফোয়ারা তুলছে। চৌরঙ্গী রোডে এক মাইল লম্বা ট্রাফিক জ্যাম। পুলিস সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। কড়া সিকিউরিটিতে হোটেলের পেছন দিক দিয়ে ভারতীয় দলকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

হৈহৈ শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। থেমে গেছে গান, হল্লা, নাচ আর উৎফুল্ল চীৎকার। কলকাতা তখন সুখতৃপ্তির কোলে গভীর ঘুমে অচেতন। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রাও তখন সারাদিনের উত্তেজনা ও পরিশ্রমের পর যে যার কামরায় গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে।

রাত বারোটা।

হোটেল রিজের দশতলার অ্যাপার্টমেন্টের একটি নিরালা ঝুলবারান্দা। একটি ছোট্ট বেঁটে ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে ওখানে। দশতলার নীচে সারাদিনের উত্তেজনার পর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে কল্লোলিনী কলকাতা। সামনে চকচকে অ্যাসফল্টে মোড়া চৌরঙ্গী রোডের ওপর নিয়নবাতির ঈষৎ বেগুনী আলো পিছলে পড়ে কী যেন এক মায়া ছড়িয়ে দিচ্ছে। আর একটু সামনে দেখা যাচ্ছে বিশাল গড়ের মাঠ। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। ছেলেটি চোখ মেলে দিল সামনে। ওই দূরে গাঢ় স্বপ্নে লীন হয়ে আছে ইডেন, ইডেন গার্ডেন। আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে তার কংক্রীটের গ্যালারী। কর্নাটকের নিঃসঙ্গ ছেলেটি সেদিকে চেয়ে আছে।

খুশী?—সহসা ফিরে এলো সেই কণ্ঠস্বর।

—হ্যাঁ। খুশী।

—ঘুমোবে না?

—যাচ্ছি। আরেক বার দেখে নিচ্ছিলাম ওকে।

—কাকে?

—ইডেনকে।

ভূতের সঙ্গে কথা বলছ নাকি?—কাঁধে একটা আলতো স্পর্শ পেতেই চমকে ঘুরে দাঁড়াল ছেলেটি। পাশে কখন্ অজান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন কর্নাটকের আরেক কৃতী পুরুষ। এরাপল্লি প্রসন্ন।

ছেলেটি সামান্য লজ্জা পেয়ে চোখ তুলতেই ওই অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পেল, প্রসন্নর চোখের কোণে রাজ্যের ক্লান্তি আর বিষণ্ণতা।

কালো ছেলেটি বলল—আপনি আজ অসাধারণ খেলেছেন। আপনার জন্যেই আমরা আবার জয়ের মুখ দেখলাম।

প্রসন্ন করুণ মুখে হাসলেন—আমি! আমি কী করেছি! একটাও উইকেট পাইনি।

—আপনি ক্যারিবিয়ান দৈত্যের পায়ে শিকল পরিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। চন্দ্র আর বেদী সেই বন্দী দৈত্যকে কুচি কুচি করে কেটেছে। আপনি অসাধ্য সাধন করেছেন। ক্রিকেটের ইতিহাস যদি সত্যবাদী হয়,

তবে আজকের খেলায় আপনার অবদানের কথা ভুলে যাবে না।

প্রসন্নর ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি দেখা গেল। একটা সিগারেট ধরালেন উনি। দেশলাইয়ের আলোয় ওঁর সেই হাসিতে ফুটে উঠেছে অভিজ্ঞ বর্ষীয়ান খেলোয়াড়ের জীবনের অনেক সাফল্য, অনেক ব্যর্থতা।

—কিন্তু তোমার কাছে আর সবাই ঢেকে গেছে।

বিনীত ছেলেটি প্রশংসা শুনে আড়ষ্ট হল, মাথা নীচু করল। প্রসন্ন ডান হাত বাড়িয়ে আলতো করে চেপে ধরলেন ছেলেটির বাঁ কাঁধ, তারপর ফিসফিস কণ্ঠে বললেন —তুই এই খেলার ম্যান অব্ দি ম্যাচ।

দূরে রাতের অন্ধকারে তখন গাঢ় স্বপ্নে লীন হয়ে আছে ইডেন।

পরদিন ভারতের সবকটা সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় একটা খবর বেরুল। খবরটির শিরোনাম 'ম্যান অব্ দি ম্যাচ।' ভারতীয় দলের ম্যানেজার রামচাঁদ ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ম্যানেজার আলেকজাণ্ডারের যুগ্ম বিচারে তৃতীয় টেস্টে কর্নাটকের গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথকে 'ম্যান অব্ দি ম্যাচ' শিরোপায় ভূষিত করা হয়েছে। এছাড়াও বিশ্বনাথকে ভারতীয় দলের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ও ফিল্ডারের সম্মান দেওয়া হয়েছে।

জয় জয় জয়! ইডেনে ভারতের যে গৌরবময় পুনরুত্থান ঘটেছিল, তারই কণ্ঠে মাদ্রাজের চীপক পরিয়ে দিল আর একটি অনন্যসাধারণ জয়মাল্য। মাদ্রাজে ভারত জিতল ঠিক একশ রানে। মোটে সাড়ে তিন দিনেই খেলা শেষ। আর এই খেলাতেও ভারত জিতল শুধু বিশ্বনাথের জন্যেই।

গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ আবার 'ম্যান অব্ দি ম্যাচ'। এই টেস্টেও বিশ্বনাথ তার অনন্যসাধারণ ব্যাটিং প্রতিভার সাক্ষর রেখে লয়েড, কালিচরণ, রিচার্ডসের মত ব্যাটসম্যানদের ম্লান করে দিয়ে 'ম্যান অব দি ম্যাচ' খেতাব ছিনিয়ে নিল।

ইডেনের দশ দিন পর ঠিক ১১ই জানুয়ারী মাদ্রাজে যবনিকা উঠল। ইডেনের মতই টসে জিতে পাতৌদি ব্যাট করতে পাঠালেন দলকে। আর সেই ইডেনের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হল এবারও। ব্যাট হাতে একে একে নামী-দামী ব্যাটসম্যানদের প্রবেশ ও প্রস্থান। এই অন্ধকার সর্বগ্রাসী ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একা অচঞ্চল আলোকস্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে অবিচল নিষ্ঠা আর সংযমের সাথে ব্যাট করে ৯৭ রানে নট আউট থেকে গেল বিশ্বনাথ। শেষ ব্যাটসম্যান চন্দ্রশেখর আর তিনটি রান করার সুযোগ দিতে পারল না তাকে। অবশ্য এই তিনটি রান বিশ্বনাথ ইচ্ছে করলে অনেকক্ষণ আগেই সংগ্রহ করে নিতে পারত যদি বিশ্বনাথের নজর থাকত তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে। কিন্তু বিশ্বনাথ সেদিন নিজের জন্যে নয়, দলের জন্যে খেলেছিল, খেলেছিল দেশের জন্যে।

পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়রা যে ইনিংস খেলার জন্য সাধনা করেন, যে ইনিংস খেলার স্বপ্ন দেখেন ব্র্যাডম্যান, সোবারসের মত খেলোয়াড়রা, ১১ই জানুয়ারী চীপকে সেই খেলাই খেলল বিশ্বনাথ। তাই পরদিন আনন্দবাজার পত্রিকা স্পোর্টস রিপোর্ট দিতে গিয়ে তিন কলমের হেডিং দিল—"বিশ্বনাথ স্বপ্নের ইনিংস খেলেছে।" স্টেটসম্যানের রিপোর্টার সেদিনের রিপোর্ট লিখতে গিয়ে শব্দই খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তিনি লিখলেন, —"সমস্ত শব্দ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, মাথা ছেয়ে আছে এক গাঢ় মাদকতায়, যখন মহান বিশ্বনাথের সেই ক্লাসিক ইনিংসটির কথা স্মরণ করতে যাই···যে বিশ্বনাথ ভারতের প্রথম ইনিংসের করুণ ধ্বংসস্তূপের মাঝে একা দাঁড়িয়ে ছিল এক নিঃসঙ্গ মনুমেন্টের মত অ্যাণ্ডি রবার্টসের শাস্ত্রীয় পেস বলের প্রাণঘাতী আক্রমণের বিরুদ্ধে।"

তাই খেলার শেষে যখন দুই দলের ম্যানেজারের যুগ্ম ঘোষণায় বিশ্বনাথকে আবার 'ম্যান অব্ দি ম্যাচ' আখ্যা দেওয়া হল, তখন শুধু বিশ্বনাথকে নয়, দুই দলের ম্যানেজারের বিচার-প্রজ্ঞাকেও সবাই অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাল।

আমাদের কাহিনী শেষ হতে পারত এখানেই। কিন্তু শুধু একটা ঘটনা বার বার আমাদের মনে পড়ে যাচ্ছে। মনে পড়ে যাচ্ছে নতুন বছরের প্রথম দিনের সেই গভীর রাত্রির কথা। সেই হোটেল রিজের দশতলার ছোট্ট একটা ঝুলবারান্দায় দাঁড়ানো করুণ হাসিমুখের এক বর্ষীয়ান বোলারকে, যিনি সেদিন একটাও উইকেট পাননি, নাম যাঁর এরাপল্লি প্রসন্ন। চতুর্থ টেস্টের

শেষে তাঁকে ঘোষণা করা হল ভারতীয় দলের শ্রেষ্ঠ বোলার হিসাবে।

প্রসন্ন দুই ইনিংসে পেয়েছিলেন মোট নয়টি উইকেট মাত্র ১০১ রানের বিনিময়ে।

এই ঘোষণায় সবচেয়ে খুশী হয়েছিল বোধহয় সেদিনের সেই কালো বেঁটে ছেলেটি, নাম যার গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ।

এর পরের ইতিহাস আরো ছোট্ট।

ক্যারিবিয়ান দৈত্যকে ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। পঞ্চম টেস্টে সে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। ভারতকে ২০১ রানের ব্যবধানে বোম্বের ওয়ানখাঁড়ে স্টেডিয়ামে হারিয়ে ৩-২ ম্যাচে সিরিজ জিতে চলে গেল ক্লাইভ লয়েডের দল।

এর সঙ্গে আমাদের উপন্যাসে যোগ করা যেতে পারে আর একটি ছোট্ট খবর, বোম্বে টেস্টের প্রথম ইনিংসে বিশ্বনাথের অনবদ্য ৯৫ রান করার কথা।

চার বছর আগে হারানো রবার ভারত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ক্লাইভ লয়েডের নেতৃত্বে। কিন্তু ক্রিকেটের প্রকৃত অনুরাগীর কাছে এটা বড় খবর নয় কখনই।

রাজার খেলা ক্রিকেট নয়, খেলার রাজা ক্রিকেট। খেলায় হারজিত আছেই, আছে ক্রিকেটেও। কিন্তু এই হারজিতটুকুই শুধু ক্রিকেট নয়, ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠত্ব, ক্রিকেটের মহত্ত্ব অন্যখানে।

ক্রিকেট খেলা মানুষকে উপহার দেয় একটা চরিত্র, যে চরিত্র মানুষের কল্পনায় এক আদর্শবিশেষ। সে চরিত্র এগারোজনের বিপক্ষীয় ব্যূহের আক্রমণের মুখে একা অভিমন্যু সদৃশ সংগ্রামে মহান, বিপদে স্থৈর্যে, সংগ্রামে অবিচল, স্বপক্ষীয় অস্তিত্বরক্ষায় অক্লান্ত স্থির-প্রতিজ্ঞ যে চরিত্র খররৌদ্রে ঝলসে ওঠে মুক্ত তরবারির মত, নিজের সকল অস্তিত্বের বিনিময়েও যে দেশ ও জাতিকে তুলে আনে পাদপ্রদীপের আলোয়।

ক্রিকেট উপহার দিতে পারে এই রকম একটি দুর্লভ চরিত্র।

এবারের খেলায় সেই রকম একটি মানুষকে উপহার দিয়ে গেল ক্রিকেট। এবারের সিরিজে এটাই সবচেয়ে বড় খবর।

এবারের সিরিজ উপহার দিয়ে গেল একজন ম্যান অব্ দি ম্যাচকে—ভারতের গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথকে।

ইতিহাসে দ্বৈরথ

বেন ষ্টারডিভ্যান্ট ও জিম বোয়ি

১৮২৬ খৃষ্টাব্দ। টেক্সাস অঞ্চলের একটি পানাগারের ভিতরে বসে তাসের জুয়া খেলছে একটি অল্পবয়সী কিশোর ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। পুরুষটি ঐ অঞ্চলের এক কুখ্যাত জুয়াড়ী ও দুর্ধর্ষ গুণ্ডা— নাম, বেন ষ্টারডিভ্যান্ট। কিশোরটির নাম—ল্যাটিমোর।

খেলা চলছে, ছেলেটি হেরে যাচ্ছে বার বার। তীব্র উত্তেজনায় তার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত।

বার বার বাজী হারছে, কিন্তু খেলা ছেড়ে ওঠার নাম করছে না।

শাবাস ! এই তো মরদের মতো কথা !
আবার খেলা চলছে, এমন সময় হঠাৎ পানাগারের দরজা ঠেলে একটি লোক প্রবেশ করলো।
ভেতরে ঢুকে খেলোয়াড়দের ওপর চোখ বুলিয়েই একটু চমকে উঠলো।
ছেলেটিকে যেন খুব চেনা বলে মনে হচ্ছে!
একি! এতো দেখছি আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ছেলে।
ছেলেটাকে সর্বস্বান্ত করছে দেখি তো ভালো করে ব্যাপারখানা!
ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলো আগন্তুক।
এতো দেখছি অসৎভাবে ঠকিয়ে লোকটা টাকাগুলো জিতে নিচ্ছে, বেচারা ছেলেটা বুঝতেও পারছে না।

আগন্তুক আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে খেলা দেখলো।
তারপর এগিয়ে এসে ল্যাটিমোরের কাঁধে হাত রাখলো।
আপনি আপনাকে তো—
তুমি আমাকে ঠিক চিনতে পারবে না, কিন্তু তোমার বাবা পারবেন। আমি তোমার বাবার বন্ধু।
শোন, তোমার তাস নিয়ে আমাকে ওর সঙ্গে একটু খেলতে দাও।
ল্যাটিমোর সম্মত হয়ে জায়গা ছেড়ে দিলো।
নিন এবারে আবার খেলা শুরু করুন।
ঠিক আছে।
আপনার কেরামতিটা এবার দেখা যাক মশাই।

কিছুক্ষণ খেলা চলার পর।
এ বাজীটাও তাহলে আমিই জিতলুম। কেরামতিটা কেমন লাগছে?
তারপর যে টাকাগুলো বেন জুয়াচুরি করে ল্যাটিমোরের কাছ থেকে জিতে নিয়েছিলো, সেই টাকা আবার নবাগত মানুষটি জিতে নিয়েছে
তাহলে যে টাকাগুলো আপনি জুয়াচুরি করে ছেলেটির কাছ থেকে নিয়েছিলেন, তা আমি জিতে নিয়েছি।
এই লোকটা অনভিজ্ঞ এক কিশোরের কাছ থেকে তার টাকা অসৎ উপায়ে ঠকিয়ে নিচ্ছিলো। দৈবাৎ আমার চোখে পড়ায় তা রক্ষা পেয়েছে।
জিতে নেওয়া টাকাগুলো আবার ল্যাটিমোরকে ফিরিয়ে দিলো আগন্তুক।
এই নাও তোমার টাকা। বাড়ি যাও, কিন্তু সাবধান! কখনও আর জুয়া খেলো না।
কার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছো তা তুমি জানো না চাঁদ! তোমার ওস্তাদি ভাঙছি!

আরে,আরে এতো তাড়াতাড়ি চললেন কোথা ?
কি বলতে চান আপনি?
চাই এই— হাঃ !
তারপর পাল্টা আঘাত হানলো আগন্তুক।
আহ্ !
আশা করি এতেই শিক্ষা হবে।
আগন্তুকের কাছে নানাভাবে অপদস্থ হয়ে বেন স্টারডিভ্যান্ট আহত বাঘের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।
যদি সাহস থাকে তো ছুরি নিয়ে আমার সঙ্গে লড়ো।
বেচারা স্টারডিভ্যান্ট ! সে কল্পনাও করতে পারে নি যে লোকটিকে সে ছোরার লড়াইতে আহ্বান করেছে, সেই লোকটি হচ্ছে সে সময়ের ছুরির লড়াইয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা জিম বোয়ি!
আচ্ছা—আমি রাজী !

জিম আত্মপরিচয় দিলো না। ভয়ঙ্কর মেক্সিকান ডুয়েল নামক রীতি অনুসারে দ্বন্দ্বযুদ্ধের উদ্যোগ হলো।

তারপর নির্দেশ পাওয়ামাত্র দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরকে আক্রমণ করলো।

কিছুক্ষণ লড়াই চললো। কয়েকবার প্রতিপক্ষের আঘাত প্রতিহত করলো জিম। তারপর হঠাৎ।

আহ্!

জিমের হাতের ছোরা আবার ঝলসে উঠলো।

না-না!

কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহে নয়—দুই যোদ্ধার বাঁ হাত বাঁধা দড়িটাকে আঘাত করলো জিমের ছোরা।

বেন স্টারডিভ্যান্ট একমাত্র ভাগ্যবান, যে জিমের সঙ্গে ছোরার দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরও জীবিত ছিলো।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

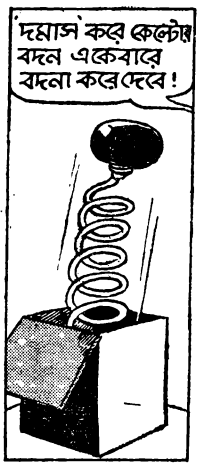

তা এতে কি আছে রে নন্টে?
খুব ভালো জিনিস কেলুদা!
তুমি ঘরে নিয়ে গিয়ে খুলে দেখলেই টের পাবে!
গুড আইডিয়া! আমিও স্যারকে কিছু প্রেজেন্ট করবো ভাবছিলুম। ভালোই হলো। এটাই আমি আমার নামে স্যারের কাছে চালিয়ে দেবো। বিনা খরচে স্যারকে প্রেজেন্ট দেওয়া হবে—হিঃ হিঃ!
অ্যাই মরেচে!
হাতে ওটা কি রে কেলু? কি আনলি?
বিশেষ কিছু না। এই আপনার জন্যে সামান্য একটু উপহার।
উদ্দোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপতে চললো মে রে মাইরি!
ঘাবড়াও ঘাৎ! আমাদের যান্ত্রিক উপায়ে না হলেও, বুধোর হাস্তিক পদ্ধতিতে কার্যসিদ্ধি হবে।
নাঃ, সত্যিই তুই আমাকে ভালোবাসিস দেখছি কেলু! কিন্তু আবার পয়সা খরচ করতে গেলি কেন?
ওসব বলে লজ্জা দেবেন না স্যার! এবার প্যাকেটটা খুলে দেখুন জিনিসটা আপনার পছন্দ হয়েছে কিনা।
সুপারিনটেন্ডেন্ট
ফল্টু, আর বোধহয় এখানে থাকা ঠিক নয়!
বড় মুখ করে যখন এলেছিস, তখন খুলে দেখি আমার জন্যে কি—
অ্যাঁক্স্!
দমাস!
এ-এ কি হোলো স্যা-স্যার?
স্যার-স্যার-
চুপ মর্কট! তোকে হাতে পেলে হয়!
আলবৎ!
যান্ত্রিক গুঁতোর চেয়ে স্যারের হাস্তিক মানে হাতের গুঁতোর চোটটা বেশিই হবে, কি বলিস ফল্টে?

পরিচালক
নিরাপদ রায়

'মহাকালের মন্দির'-এ 'ডাকবাংলোর শয়তান'! ভাবের ঘরে পুকুরচুরি!!

পুজাবকাশে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে বেড়াতে যায় তিন বন্ধু। ঘুরতে ঘুরতে পুরোনো পরিত্যক্ত এক ডাকবাংলো তাদের চোখে পড়ে এবং সেখানেই রাত কাটাবে বলে স্থির করে তারা। এ বিষয়ে স্থানীয় লোকদের মত জানতে চাইলে তারা প্রবল আপত্তি জানায়, কারণ বছর-খানেক হল ঐ ডাকবাংলোয় নাকি আস্তানা গেড়েছে ভয়ঙ্কর এক শয়তান। এক বছর আগে বাইরের এক ভদ্রলোক ওখানে রাত্রিযাপন করেন। পরদিন তাঁর জিনিসপত্র সবই অক্ষত-অটুট থাকলেও তাঁর আর পাত্তা পাওয়া যায় না। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে মাত্র মাসখানেক আগে। গ্রামেরই একটি অসমসাহসী তরুণ শাবল ও তীরধনুক নিয়ে ডাকবাংলোর বারান্দায় শুতে যায় শয়তানকে দেখে নেবে বলে। তাকেও পরদিন খুঁজে পাওয়া যায় না। এইসব কাহিনী শুনে তিন বন্ধুর জেদ চেপে যায় এবং আদিবাসীদের পুনঃপুনঃ ব্যাকুল নিষেধ সত্ত্বেও তারা ঐ বাংলোয় পর পর দুটি রাত কাটায়। দ্বিতীয় রাতে ভয়াল এক পরিস্থিতির মধ্যে তারা শয়তানের রক্ত-জল-করা দেখা পায়, অবশেষে গ্রামবাসীদের সংঘবদ্ধ অস্ত্রাঘাতে অমিত-পরাক্রম সেই শয়তান নিহত হয়। পাকা ষোল হাত দীর্ঘ ও সেই অনুপাতে স্থূল এক অজগরই সেই শয়তান।

কিশোর ভারতীয় ৩য় বর্ষ : ষষ্ঠ সংখ্যায় (মার্চ ১৯৭১) রহস্য-ভয়াল এই সত্য কাহিনী প্রকাশিত হয় 'ডাকবাংলোর শয়তান' শিরোনামে। দীরক, তপন ও সুজিত—সেই তিন বন্ধুরই একজন সুজিতকুমার সেনগুপ্ত ঐ কাহিনীর রচয়িতা এবং 'ডাকবাংলোর শয়তান'-এর অলঙ্করণে ছিলেন কিশোর ভারতীর নিয়মিত শিল্পী ময়ূখ চৌধুরী (প্রসাদ রায়)।

খুব সম্প্রতি অন্নপূর্ণা পাবলিশিং হাউস 'মহাকালের মন্দির' নামে ময়ূখ চৌধুরীর চিত্র-কাহিনীর একটি বই প্রকাশ করেছেন। ময়ূখবাবুর বই বেরুচ্ছে জেনে আমরা আনন্দিত ও উৎসুক হয়েছিলাম এবং প্রকাশককে তাঁদের এই উদ্যমের জন্যে মনে মনে ধন্যবাদও জানিয়েছিলাম। কিন্তু 'মহাকালের মন্দির'-এ ময়ূখ চৌধুরীর কাণ্ডকারখানা দেখে আমরা থ হয়ে গেছি। একদা যে কাহিনী পড়ে মুগ্ধ হয়ে তিনি সাগ্রহে তার ছবি এঁকে দিয়েছিলেন সেই 'ডাকবাংলোর শয়তান'-এর কাহিনীটি দিয়েই তিনি তাঁর 'মহাকালের মন্দির' রচনা (?) করেছেন। তফাত অবশ্য কিছু রাখতে হয়েছে, কিন্তু তা শুধু বহিরঙ্গে। যেমন, ডাকবাংলো এখানে হয়েছে মন্দির, তিন বন্ধুর পরিবর্তে এসেছেন মহারাজ রুদ্রদমন, অজগর-কবলিত ভদ্রলোক ও গ্রাম্য যুবক এখানে পুরোহিতের নামাবলী পরে উপস্থিত। তাছাড়া পুরো গল্পটি হুবহু এক। **কিশোর ভারতীর যত ঘনিষ্ঠ জনই হোন না কেন, অসততার আশ্রয় নিলে কিশোর ভারতী কাউকে প্রশ্রয় দেয় না। ময়ূখ চৌধুরীর এই কাহিনী-আত্মসাতের আমরা তীব্র নিন্দা করছি।**

—রঞ্জন

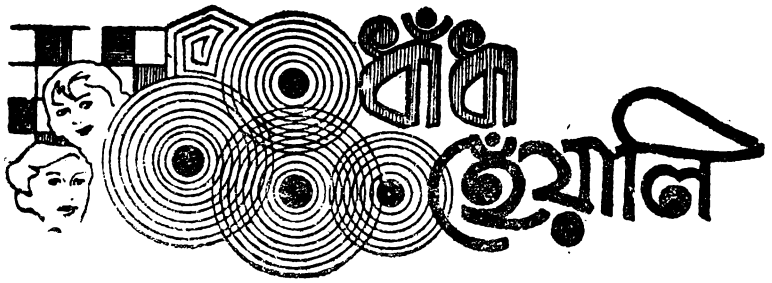

পরিচালক ঃ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

এবারে থাকছে চিরনূতন সেই শব্দ-হেঁয়ালি। বিচিত্রসুন্দর এই শব্দ-হেঁয়ালিটি তৈরি করেছে কিশোর ভারতীর একজন অন্তরঙ্গ পাঠক **দুলালচন্দ্র বণিক**, কলিকাতা ৩৭। উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ২৫শে মার্চ ১৯৭৫।

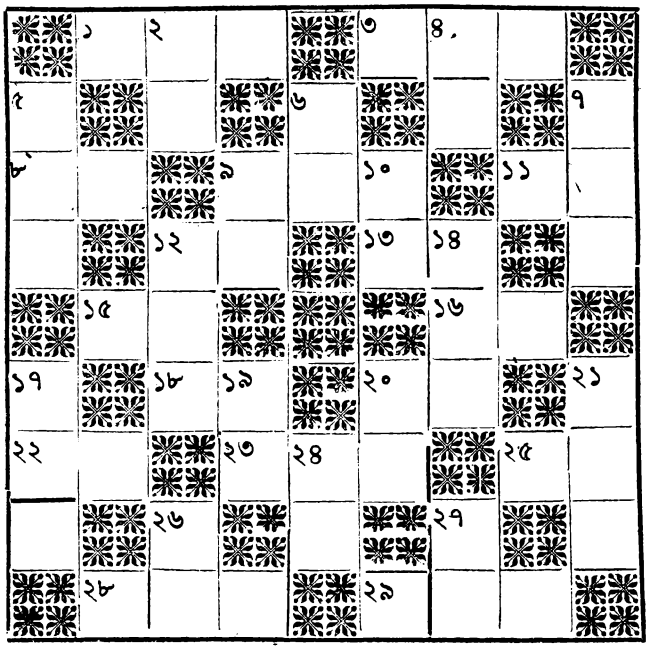

সূত্র

পাশাপাশি

১। বুদ্ধদেবের অপর নাম; ৩। নদী; ৮। বড় পাত্রবিশেষ; ৯। নারী; ১১। একপ্রকার অস্ত্র; ১২। নৌকাতে ব্যবহৃত হয়; ১৩। রামচন্দ্রের পিতামহ (উল্টো); ১৫। ছোট চুপড়ি (উল্টো); ১৬। এক-প্রকার গন্ধ দ্রব্য যাহা ভাজিলে সুগন্ধ হয়; ১৮। পূজায় ব্যবহার হয় এইরূপ তামার থালা; ২০। রাশিচক্রের একটি রাশি; ২২। লাঙ্গল; ২৩। একপ্রকার টক-মিষ্টি ফল; ২৫। একপ্রকার গাছ; ২৮। শিবরাত্রির ব্রত উদ্‌যাপনে প্রয়োজনীয় একপ্রকার ফল; ২৯। সরু নৌকা।

উপর থেকে নীচে

২। একপ্রকার শয্যাদ্রব্য; ৪। শত্রু; ৫। মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ; ৬। বড় বাতাসা; ৭। উপমাংশ; ৯। কাঁসার থালা; ১০। একপ্রকার টুপি; ১২। হাল্‌কা নাগরাই জুতা; ১৪। অনুপমা; ১৭। নারীর এক-প্রকার ব্রত; ১৯। জল রাখিবার পাত্রবিশেষ; ২০। নবজাত; ২১। সন্ন্যাসীদের জলপাত্রবিশেষ; ২৪। তীর; ২৬। জামার হাতার অগ্রভাগ; ২৭। এক-প্রকার গহনা।

গত অক্টোবর ১৯৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত শব্দ-হেঁয়ালির উত্তর ও নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

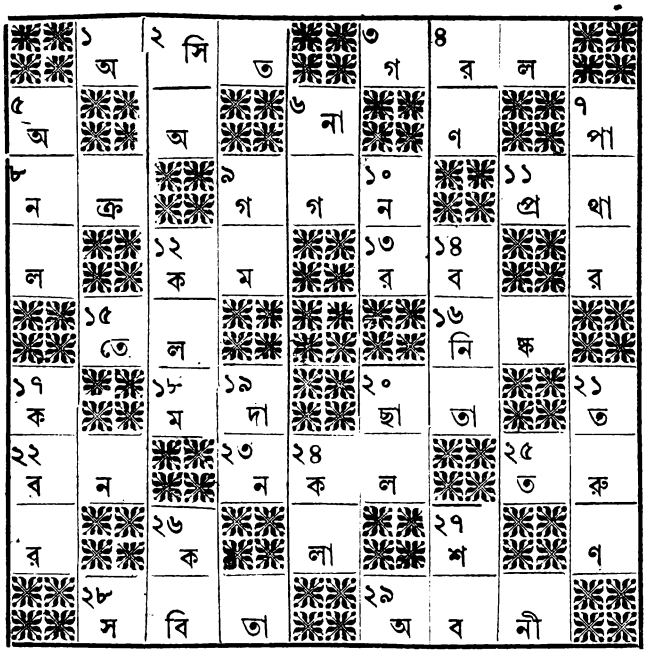

রতন ও পান্না, কল্যাণনগর; মধুমিতা ও শ্রাবণী সরকার, শিলিগুড়ি; আরতি, তপন ও শুক্লা বসাক, বেলঘরিয়া; সঞ্জয় সাহা, বিভু ও গৌতম চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি; চুমকি ও বুলবুল সেনগুপ্ত, ঢাকুরিয়া; শম্ভু, সাগর ও বীরেন, কদমতলা; সুপ্রিয়া, সুমিতা ও দেবাশিস সরকার, কলিকাতা ৫০; সমীরবরণ চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার দে ও সমর মালাকার, গড়বেতা; শুভা, এলা ও প্রতীপকুমার হালদার, কোন্নগর; রুমা, গৌতম ও তাপস রায়, কলিকাতা ১২; মৃণালকান্তি ও কুমকুম চট্টোপাধ্যায়, বারুইপুর; নিশিকান্ত, শ্যামল ও সন্ধ্যারাণী বাগ, হাবড়া; গদা, পদ্মা ও বুড়ো বিশ্বাস, আলিপুর; প্রভাতরঞ্জন, ধ্রুবরঞ্জন ও চিত্রা হালদার, ভদ্রকালী; স্বপন, অশোক ও অরুন্ধতী দাশ, শ্যামনগর প্রাণেশ, জ্ঞানেশ ও শম্পা ঘোষ, এলাহাবাদ; মধুমিতা, সুস্মিতা ও কাজল বেরা, তমলুক; স্বপ্না ভাওয়াল, কলিকাতা ৪; জুনা, জুলা দাশ ও তাদের মামণি, বেলুড় মঠ; তাপস গুপ্ত, কল্যাণী; চঞ্চল ব্যানার্জী ও আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর (বিজ্ঞান বিভাগ) ছাত্ররা; তপন, কল্যাণ ও কৃষ্ণা বসু, নূতন দিল্লী; একবাল আলি, শিলং; জয়দীপ, সুদীপ ও কল্পনা হালদার, ভুবনেশ্বর ৯; সুদীপ ঘোষ, রিষড়া; কিরণ, বেলা ও ইলা চন্দ, কলিকাতা ২৮; শোভা, আভা ও ইভা মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন।

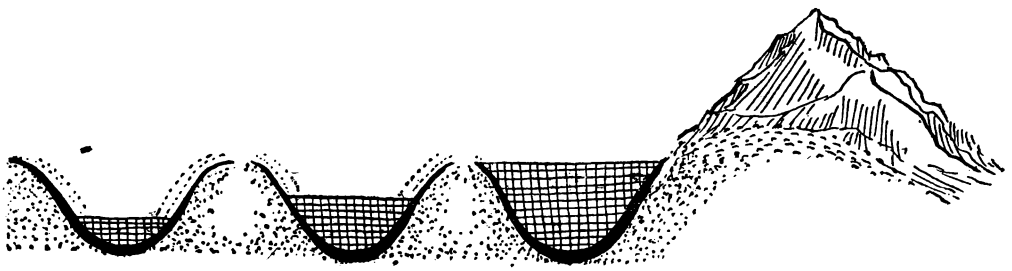

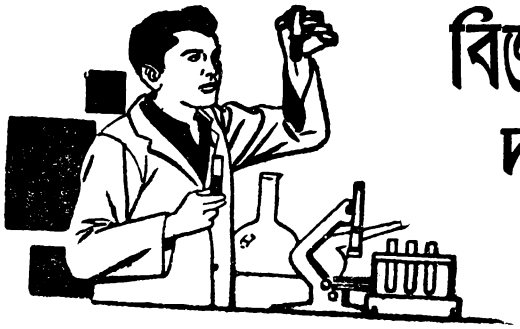

বিজ্ঞানীর দপ্তর

* পরিচালক *

কিশোর বিজ্ঞানী

টায়ার-সার

গাড়ীর টায়ার ফুটো হয়ে গেছে। রেখে দিয়ে কী হবে? হ্যাঁ, হবে, যদি কিছুটা জমির মালিক হওয়া যায়। কথাটা হেঁয়ালির মত ঠেকছে কি? না, হেঁয়ালি নয়। কথাটা মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদ্বয় গ্লেন ও ওয়ার্ড-এর।

তাঁরা বলছেন, পুরোনো রাবারের টায়ারগুলি মেশিনে পাউডারের মত গুঁড়ো করে যদি মাটির উপরে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে এই গুঁড়ো মাটির উৎকর্ষ বাড়াবে অর্থাৎ সারের কাজ করবে। এটা মাটির এঁটেল ক্ষমতা অর্থাৎ ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়াবে, তাকে চাষবাসের উপযোগী করে তুলবে। তবে তাঁরা একথাও বলছেন যে, এই সার পড়োজমি বা খেলার মাঠ অর্থাৎ যে জমি চাষবাসের মোটেই উপযোগী নয় তার এঁটেল ক্ষমতা বাড়িয়ে তাকে চাষের উপযোগী করে তুলতে পারে। কিন্তু চাষের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত জমিতে সার হিসেবে একে প্রয়োগ না করাই ভাল। জিংক অক্সাইড্ থাকার জন্য সদ্য গজিয়ে ওঠা অঙ্কুরের ক্ষেত্রে এই সার মারাত্মক হতে পারে।

নতুন ধরনের প্লাস্টার

স্টীম এঞ্জিনের বয়লার ইত্যাদির ঢাকনি দেবার জন্য এক নতুন ধরনের প্লাস্টার আবিষ্কৃত হয়েছে। পূর্বে উঁচু দরের অ্যাস্‌বেস্‌টস্ জাল এবং ম্যাগ্‌নেশিয়ার্মে ভিত্তি করেই ওই প্লাস্টার তৈরী হত। ফলে খরচও পড়ত অনেক বেশী। সেইক্ষেত্রে কানপুরের ভি. ডি. মিশ্রের আবিষ্কৃত প্লাস্টারে খরচ অনেক কম। শ্রীমিশ্র তাঁর তৈরী প্লাস্টারে ব্যবহার করেন অতি নিম্নমানের অ্যাস্‌বেস্‌টস্ জাল, ট্যালকাম, বালি এবং যেসব অভ্র কোন কাজে লাগবে না বলে ফেলে দেওয়া হয়, সেই বর্জিত অভ্র। এই উপকরণগুলি গুঁড়িয়ে মিশিয়ে প্লাস্টার তৈরি করা হয়। —ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

তুষ থেকে ইট!

ভাবলে সত্যিই অবাক লাগে যে, সাধারণ তুচ্ছ ধানের খোসা বা তুষ দিয়ে তৈরী হবে ঘর-বাড়ী তৈরীর ইট! একথা সত্যি, সাধারণ মানুষের নজরে যে বস্তুর কোন কদর বা দাম নেই, সে বস্তুই আবার বহুমূল্য হয়ে ওঠে বিশেষজ্ঞদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই। অতি সাধারণ ধানের তুষ, যা আমরা অবহেলায় ফেলে দিই, আমাদের যে কত প্রয়োজন মেটাতে পারে, সে কথা আমরা জানতে পারলাম সচেষ্ট বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকেই। তুষের কদর কোন কালেই ছিল না, একথা বললে অবশ্য ভুল হবে; কেননা এবস্তুটি বহুদিন থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে শব্দ-প্রতিরোধক হিসাবে। একথাও অনেকেরই হয়ত অজানা। আমরা একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবো যে, বড় বড় সিনেমা বা থিয়েটার হলের ভেতরে বসলে হলের বাইরের হৈ-চৈ কোলাহল ইত্যাদি একদম শুনতে পাই না। এর কারণ কী? এর কারণ খুঁজতে গেলেও মূলে পাই ধানের তুষ, আখের ছিবড়া ইত্যাদি বস্তু। বড় বড় সিনেমা কি থিয়েটার হল তৈরি করার সময় তুষ, আখের ছিবড়া ইত্যাদি সিমেন্টের সাথে মিশিয়ে দেয়ালগুলিতে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়। আর তারই ফলে বড় বড় সিনেমা-থিয়েটার হলে

বাইরের কোনপ্রকার শব্দই ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না।

বর্তমানে আবার বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষাগারে অনেক অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ধানের তুষ দিয়ে ইটও তৈরি করতে পারা যায়। নিঃসন্দেহে এক অভিনব আবিষ্কার এটা। এতদিন তো সকলেই জানতাম, মাটি দিয়ে ইট বানিয়ে তা আগুনে পুড়িয়ে শক্ত ইট তৈরী হয়। এতে সময়ও খরচ হয় প্রচুর। কিন্তু মাটি আর আগুন ছাড়াও ইট তৈরীর এক নতুন পদ্ধতি বের করেছেন আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ। এতে সময়ও খরচ হয় অতি সামান্য। তুষের ইট তৈরি করে ব্যবহারের উপযোগী করতে সময় লাগে বড়জোর মাত্র সাত দিন। তুষ, সামান্য মাটি, সিমেন্ট ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে অতি সুন্দর হাল্কা এক ধরনের ইট তৈরি করা যায়। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত আমাদের ঘর বাড়া তৈরি করতে মাটির তৈরী ইটের বদলে তুষের তৈরী ইটই শুধু ব্যবহৃত হবে।

জাল ধরার মেশিন

তোমরা দেখে থাকবে, অনেকে অনেকসময় টাকা হাতে নিয়ে উঁচু করে চোখের সামনে ধরে দ্যাখে—নোটটি আসল, না নকল। নোটটিতে জলছাপ আর কালোমত সরু সোজা দাগ থাকলে বুঝে নিতে হবে যে, নোটটি আসল আর এগুলো যদি না থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে টাকাটা জাল।

যারা জাল বা নকল করে, তারা শুধু নোটই জাল করে না, সম্পত্তির দলিলপত্র, ব্যাঙ্কের চেক, লোকের সই ইত্যাদিও নকল করে থাকে। সেগুলো সাধারণ মানুষ চট করে বুঝতে বা ধরতে পারে না। পুলিসের লোকজনও এসব জাল-জোচ্চোরদের ধরার জন্যে হয়-রানির একশেষ হয়।

এতসব অসুবিধের চিন্তা করেই বুদ্ধিজীবী মানুষ একটি মেশিন তৈরি করতে পেরেছে, বৈজ্ঞানিক যুগের এক বিস্ময়কর নিদর্শন স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এতে ত্রিশ শতাংশ থেকে নব্বই শতাংশ জাল চেক ধরা যায়। এরকম একটি মেশিন বৃটেনের সেন্ট্রাল পার্ক হোটেলে রাখা আছে। বিলের টাকা মেটাবার জন্যে কেউ যদি আসে, তবে তাকে বিলটির পেছনে একটি টিপ-সই দিতে হয়। বুড়ো আঙুলটি লাগাবায় সাথে সাথেই বুঝতে পারা যায় সইটি আসল কি নকল। এরকম মেশিন আমেরিকাতে বহু আগে থেকেই চালু আছে।

—বগলা যোগশর্মা

ঝালাই-এর পরিবর্তে আঠার ব্যবহার

একটা যে কোন রেডিও বা ট্রানজিস্টার সেটের পিছন দিককার ঢাকাটা খুললেই তোমরা দেখতে পাবে যে, রেডিওর ছোট-বড় বিভিন্ন যন্ত্রাংশগুলো ঝালাই করে জোড়া হয়েছে। শুধু যে রেডিওর যন্ত্রাংশ-গুলো জুড়তেই ঝালাই করার প্রয়োজন হয় তা-ই নয়, আরো অনেক রকম ইলেক্‌ট্রনিক্স শিল্পে এর প্রয়োজন হয়ে থাকে।

এই ঝালাই করার প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। কিন্তু তবু এটা একটা শ্রমবহুল এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই রশিয়ার ইঞ্জিনীয়াররা এখন বিদ্যুৎ-পরিবাহী পলিমের এক রকম আঠা প্রস্তুত করেছেন। এই বিদ্যুৎ-পরিবাহী পলিমের আঠা দিয়ে খুব সহজেই এবং তাড়াতাড়ি নানা রকম ইলেক্ট্রনিক্স কলকব্জা জুড়তে পারা যায়। এই আঠা ঝালাই-এর মতই মজবুত হয়।

তাই বলছিলাম কোন রেডিও বা ট্রানজিস্টার সেটের পিছন দিককার ঢাকা খুললে এখন যেমন তোমরা দেখছো এর কলকব্জাগুলো ঝালাই করে জোড়া হয়েছে, তেমনই কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো তোমরা দেখতে পাবে যে, ঐসব কলকব্জাগুলো ঝালাই করে নয়—আঠা দিয়ে জোড়া হয়েছে।

—নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

*

এই অধ্যায়ে আমরা ডন দিয়ে শুরু করব। খালি হাতে ব্যায়ামই বল, আর ওজন নিয়ে ব্যায়ামই বল, ডন ছাড়া ব্যায়াম সম্পূর্ণ হয় না। অরেকটা হল বৈঠক, তার কথায় পরে আসব। ডনের বিকল্প ব্যায়াম যে নেই তা নয়, যেমন প্যারালাল বার, বেঞ্চ প্রেস ইত্যাদি, কিন্তু তবু আমি বলব, ডনের মত ব্যায়াম হয় না। বিশেষ করে তোমরা যারা বাড়িতে ব্যায়াম করতে চাও তাদের পক্ষে এটা একটা চমৎকার ব্যায়াম। সেই আদ্যিকাল থেকে ব্যায়ামবীররা ডন আর বৈঠক দিয়ে আসছেন, আজো ও দুটোর জনপ্রিয়তা কমেনি। শুধু তাই নয়, কুস্তিগীররাও ডন-বৈঠকের পর আখড়ায় নামেন।

ডনে শুধু বুকের ছাতির মাপই বাড়ে না, শরীরের অন্যান্য অংশের মাংসপেশীরও যথেষ্ট নাড়াচাড়া পড়ে, ফলে সহজেই সুগঠিত দেহ গড়ে ওঠে। তবে ডনটা তোমরা দেবে ব্যায়ামের গোড়ার দিকে, অর্থাৎ ওটা দিয়েই শুরু করবে। প্রথম প্রথম ডনে গায়ে বেশ ব্যথা হবে, কিন্তু আস্তে আস্তে তা মিলিয়ে যাবে। আরো একটা কথা, ডন যাতে নির্ভুলভাবে দিতে পার সে দিকে গোড়া থেকেই নজর দেবে, কারণ তা না হলে বুকের ছাতির আকার বিকৃত হয়ে যেতে পারে। নিয়মিত এবং নির্ভুল ডনে অল্প দিনের মধ্যেই তোমরা সুগঠিত দেহের অধিকারী হতে পারবে আর সেইসঙ্গে অর্জন করবে শক্তি, কারণ শক্তি-বৃদ্ধির চমৎকার ব্যায়াম হল ডন।

অনেক রকম ডন আছে; আমি কয়েকটা তোমাদের শেখাচ্ছি। অবশ্য সবগুলো তোমাদের করতে হবে না, যেটা ভাল লাগে বা সুবিধে মনে হয়, সেটাই করবে।

(১) মাটির ওপর উপুড় হও। পা দুটো জোড়া কিংবা সামান্য ফাঁক রেখে টান টান করে পেছন দিকে মেলে দাও। দুই কনুয়ের ওপর ভর দিয়ে শরীর যতটা পার তোল। কনুই ভাঙবে না, সমান্তরাল অবস্থায় থাকবে। দুহাতের চেটো এক কি দেড় হাত তফাতে মাটির ওপর সমরেখায় রাখ। বুক আর কোমর মাটি থেকে কিছুটা ওপরে উঠেছে, তাই না? হাঁটু কিন্তু মুড়বে না। এবার দম নিতে নিতে শরীর যতটা পার পেছন দিকে নিয়ে এস (১নং ছবি); এবার দম ছাড়তে ছাড়তে শরীরটাকে এগিয়ে আনতে থাকো আর সেইসঙ্গে কনুই ভেঙে বুক নামিয়ে মাটি ঘেঁষে আবার ঠেলে ওপরে তোল। অর্থাৎ কোমর ভেঙে মাটি ঘেঁষে আছে, কিন্তু দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে তোমার বুক আর কাঁধ ওপরে উঠে গেছে। এই ডনে আমরা তিনটে পর্যায় পাচ্ছি। প্রথম, কনুইয়ে ভর দিয়ে শরীর তুলে যতটা সম্ভব পেছনে নিতে হবে; দ্বিতীয়, শরীর এগিয়ে আনার সময় কনুই ভেঙে বুক আর কোমর মাটি ঘেঁষে নামাতে হবে। আর তৃতীয় হল, মাথা সামনে আসার

পর কনুইয়ে ভর দিয়ে বুক আর কোমর আবার টান টান করে ওপরে তুলতে হবে। এই তিনটে পর্যায় বা স্টেজের মধ্যে কিন্তু বিরতি হবে না, এক দমেই হবে।

ডনের সময় মুখ নিচু করবে না, সামনের দিকে তাকাবে আর বুক নামাবার সময় যত চাড় দিয়ে নামাতে পারবে তত বেশি টান পড়বে বুকে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বুক ওঠাবার সময় কনুই দুটো একই সঙ্গে সোজা হয়। ডান হাতের কনুই সোজা হয়েছে আর বাঁ হাতের

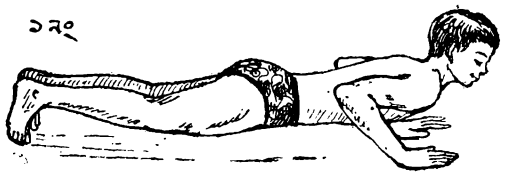

কনুই আধখানা ভাঙা, এমন যেন না হয়। প্রথম প্রথম তোমাদের অসুবিধে হবে, ভুল-ভ্রান্তিও ঘটবে, কিন্তু সে জন্যে নিরাশ হবার কারণ নেই। ডন বেশ শক্ত ব্যায়াম, রপ্ত করতে একটু সময় লাগবে আর রপ্ত হয়ে গেলে দেখবে কী সহজ! শুরু করার পক্ষে এ ডনটাই ভাল।

(২) দুই কনুই না মুড়ে সোজা সমান্তরাল অবস্থায় আর পা দুটো পেছনে টান টান রেখে প্রস্তুত হও। এবার আর শরীর পেছনে নেবে না। দম নিতে নিতে খাড়াভাবে বুক ঝপ করে নিচে ফেলবে আর দম ছাড়তে ছাড়তে ওঠাবে। বুক কিন্তু মাটি ছোঁবে না, আগেরটাতেও নয়। এই ডনে বুক আর কোমর সামনের দিকে ওঠানো অবস্থায় থাকবে, শুধু নামাতে আর ওঠাতে হবে।

(৩) ১নংয়ের মত দম নিতে নিতে শরীর পেছনে নিয়ে এস। এবার কিন্তু কনুই মুড়বে না, বুকও মাটি ঘেঁষে উঠবে না। দম ছাড়তে ছাড়তে শরীর এগিয়ে নিয়ে এস, তারপর ঝপ করে বুক নামাও। বুক তুলে দম নিতে নিতে শরীর আবার পেছনে টেনে নিয়ে এস। ২নং আর ৩নংয়ে তফাত হল: আগেরটাতে শরীর স্থির থাকছে, শুধু বুক ওঠানামা করছে, আর এটাতে ১নংয়ের মত শরীর পেছন দিকে টেনে নিতে হচ্ছে, কিন্তু কনুই সোজা থাকছে এবং শরীর ওঠানো অবস্থায় রেখেই এগিয়ে এসে বুক ফেলতে হচ্ছে। এটাতে বুকে একটু বেশি টান পড়বে।

(৪) মাটিতে হাত না রেখে ইঁটের ওপর রেখেও ডন দেওয়া যায়। বুক আর মাটির ব্যবধান যত বেশি হবে, বুকে চাপ পড়বে তত বেশি। পর পর দুটো থান ইঁট দুধারে বসিয়ে ডন দিতে পার। যদি সম্ভব হয়, তবে ছুতোর মিস্ত্রি দিয়ে কাঠের 'ডন বার' তৈরি করে নেবে। ডন বারের একটা ছবি দেওয়া হল। ওটা ইচ্ছেমত কমানো-বাড়ানো যায়। ডন বারে ওপরের ২নং আর ৩নং ব্যায়ামটাই ভাল হয়, আর বুকে দারুণ চাপ পড়ে। চড়চড় করে বুক বাড়বে। তবে প্রথমেই ডন বারের দিকে ঝোঁক দেওয়া উচিত হবে না, কারণ ওটা বেশ ভারী ব্যায়াম। ডন ভাল মত রপ্ত হবার পরই ডন বারের কথা ভাবা যেতে পারে।

(৫) হাত মাটিতে রেখে (১নং ব্যায়ামের মত) পেছনে মেলে দেওয়া পা দুটো কোনো উঁচু জায়গায়, যেমন সিঁড়ির দু ধাপ ওপরে কিংবা টুলের ওপর, রাখ। এবার ২ বা ৩ নং ডনের যেটা ইচ্ছে কর। এটাতেও বুকে খুব চাপ পড়বে।

(৬) পা দুটো টুল বা উঁচু কিছুর ওপর রেখে ডন বারে ডন দিলে সবচেয়ে বেশি চাড় লাগে বুকে। ডনের

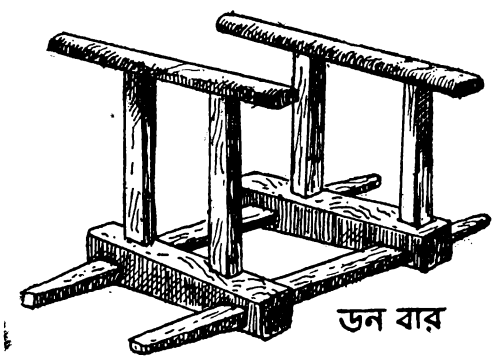

মধ্যে এটাই সবচেয়ে কঠিন আর ফলও পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি। আগেই বলেছি, ডন বারে ২নং কিংবা ৩নং ডনই দেবে। ডন কাঠের হাতল শক্ত করে চেপে ধরবে আর বুক আস্তে আস্তে ফেলবে না, জোর দিয়ে ঝপ করে ফেলবে, দেখবে কী ভীষণ চাপ পড়ে! প্রথম দিকে

ব্যথাটাও টের পাইয়ে দেবে তোমাদের, তবে দুতিন দিনেই গায়ের ব্যথা মরে যাবে। ডন বার বেশি ফাঁক করবে না আবার বেশি কমিয়েও নেবে না—এক থেকে দেড় হাতের মধ্যে রাখবে।

ডনের সময় দুটো জিনিস খুব লক্ষ্য রাখবে। প্রথম, বুক একসঙ্গে পড়বে আর নামবে অর্থাৎ কোনো একদিক আগে পরে হবে না আর দ্বিতীয়, কনুই দুটো একই সঙ্গে ভাঙবে আর সোজা হবে। এক কথায়, বুক ওঠানামা এবং দুই কনুই ভাঙা ও সোজা হবার মধ্যে একটা সুসামঞ্জস্য থাকবে। দুপা কিছুটা ফাঁক রাখলেও ক্ষতি নেই।

ডন নিয়মিত দেবে। মজবুত শরীর আর শক্তি অর্জনের এটা হচ্ছে অন্যতম ব্যায়াম। প্রতিটি ব্যায়ামে যে যে মাংসপেশীর ওপর চাপ পড়ে তাদের ম্যাসাজের কথা আগে বলা হয়েছে। ডনের বেলায় হাত বুকের তলায় রেখে আস্তে আস্তে নাড়াবে যাতে বুকে দোলা পড়ে।

গত অধ্যায়ে চোখ ভাল রাখার ব্যাপারে দুচার কথা বলা হয়েছে, এ অধ্যায়ে দাঁত নিয়ে কিছু বলব। কথায় বলে, দাঁত থাকতে দাঁতের কদর বোঝে না। কথাটা খুবই সত্যি। দাঁত থেকে যে কত রকম রোগ হতে পারে সে বিষয়ে আমরা তেমন সচেতন নই। দাঁতের রোগে খুব ভাল স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে এমন ঘটনাও বিরল নয়। তাই পেশীবহুল দেহ গড়ে তোলার জন্য যেমন ব্যায়াম করা দরকার, তেমন চোখ ও দাঁতের অযত্ন যাতে না হয় সে-দিকেও লক্ষ্য রাখা আমাদের কর্তব্য। দাঁত ভাল রাখার জন্য তোমরা যা যা করবে তা হল :

১. টুথ ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজবে। (নিমের দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজাও খুব ভাল। ব্রাশ ওপর থেকে নিচে, আড়াআড়িভাবে, তারপর গোল করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দাঁতের ওপর ঘষবে।

২. দাঁতের পেছন দিক ভাল করে ঘষবে।

৩. কিছু খাবার পরেই কুলকুচো করবে।

৪. রাত্তিরে শোবার আগে দাঁত মাজবে। এটা নিশ্চয়ই করবে, কারণ খাদ্যবস্তুর কণা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে জমতে থাকে, পরে শক্ত হয়ে যায়। দিনের বেলা আমরা সব সময় মুখ নাড়ি, মাঝে মাঝে মুখে জল দিই, তাই খাদ্যবস্তুর কণা তেমন জমতে পারে না, কিন্তু সারা রাত আমরা ঘুমিয়ে থাকি আর সেই সুযোগে ওগুলো দাঁতের ফাঁকে গেড়ে বসে। সকালে মুখ ধোবার সময় যে কণা-গুলো দাঁতের ফাঁকে বেশ ভেতরে ঢুকে গেছে, সেগুলো আর বেরুতে চায় না। এভাবে দিনের পর দিন থাকার ফলে কণাগুলো পাথরের মত শক্ত হয়ে যায় আর দাঁতের ক্ষতি করে। বিলেতে ছেলেমেয়েদের রাত্তিরে শোবার আগে দাঁত মাজা ছোটবেলা থেকেই অভ্যেস করানো হয়।

৫. পিন কিংবা সেফটিপিন দিয়ে দাঁত খোচাবে না। দাঁতে কিছু ঢুকেছে মনে হলে দাঁত খোচাবার কাঠি দিয়ে আস্তে আস্তে তা বের করে ফেলবে। মরচে-পড়া কিছু দিয়ে দাঁত কখনই খোঁচাবে না। পিন দিয়ে যদি খোঁচাতে হয়, তবে সেটা আগে আগুনে অবশ্যই পুড়িয়ে নেবে।

৬. দাঁত কনকন করলে ঈষদুষ্ণ জলে কুলকুচো করবে। দুচার ফোঁটা পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট জলে দিয়ে কুলকুচো করা ভাল।

৭. মাঝে মাঝে পেস্ট দিয়ে মাড়ির ওপর আস্তে আস্তে আঙুল বুলিয়ে ম্যাসাজ করবে।

চোখ ও দাঁতের ব্যাপারে গণ্ডগোল দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। খারাপ দাঁত মজবুত শরীরকে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারে, এ কথাটা ভুললে চলবে না। তাছাড়া দাঁত শক্ত না থাকলে মাংসের হাড় চিবুবে কেমন করে, বল ?

× ×
× ×

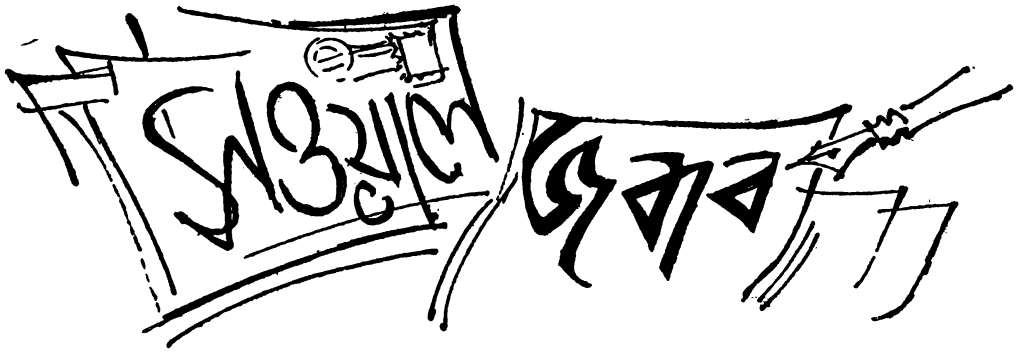

সুনির্মল দাস, শ্যামসায়র, বর্ধমান

—কেঁচোকে দ্বিখণ্ডিত করলেও মরে না কেন ?

: কেঁচোর দেহ আংটির মত শতাধিক খণ্ড দিয়ে স্তরে স্তরে সাজানো। কিন্তু খণ্ডগুলো ফিতাকৃমির দেহের মত এক-একটি আলাদা প্রাণী নয় বলে, দ্বিখণ্ডিত কেঁচো বাঁচে না। তবে মাথার দিকের অংশটি অনেক সময় বেঁচে যায়।

—মঙ্গল গ্রহে কোন জীব বা উদ্ভিদের অস্তিত্ব আছে কি ?

: এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর এখনও কেউ জানে না। তবে মঙ্গল গ্রহের আবহমণ্ডল এবং পরিবেশ সম্বন্ধে অনেক খবরই নিশ্চিতভাবে জানা গেছে। গ্রহটি পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট, ওজনে প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। পৃথিবীর তুলনায় আবহমণ্ডলের ঘনত্ব শতকরা মাত্র তিন ভাগ। মঙ্গল গ্রহে জলীয় বাষ্প আছে নগণ্য পরিমাণে। নিরক্ষঅঞ্চলে মধ্যদিনের তাপাঙ্ক ছয়-সাত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশী নয়। এমন পরিবেশে কোন উন্নত ধরনের প্রাণী থাকতে পারে না বলেই বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তবে নিম্নস্তরের এককোষজীবী প্রাণী বা শ্যাওলা জাতের উদ্ভিদ হয়ত থাকলেও থাকতে পারে।

প্রবীর দাস, টেম্পল স্ট্রীট, জলপাইগুড়ি

—কতকগুলো কেঁচো একটা কৌটোতে রেখে দিলে সেগুলো রেডিয়ামের মত জ্বলজ্বল করে কেন ?

: কেঁচোর দেহ সবসময় আর্দ্র ও পিচ্ছিল থাকে এবং তাতে মেশানো থাকে ফসফরাস। নাড়াচাড়া করলে ফসফরাস থেকে ক্ষীণ আলো বিচ্ছুরিত হয়। সেইজন্যেই রাত্রির অন্ধকারে খাদ্যের সন্ধানে কেঁচো যখন হেঁটে বেড়ায়, তখন তার দেহ থেকে বিকিরিত হয় রেডিয়ামের মত স্নিগ্ধ আলো। কৌটোর মধ্যে কেঁচো রাখলেও এই ব্যাপার ঘটে।

সোমনাথ, তাপস ও তন্ময় রায়, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

—পৃথিবীতে ক্ষুদ্রতম প্রাণী কী ?

: পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট প্রাণী হল ভাইরাস। প্রায় অ্যাটম বা অণুর মতোই ছোট। গাছপালা এবং প্রাণীদেহে নানাধরনের রোগের সৃষ্টি করে এরা। এক ঘন মিলিমিটারের মধ্যে প্রায় লাখখানেক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের ভাইরাস থাকতে পারে। এরা যে কত ছোট তা বোধ হয় খানিকটা বুঝতে পারছ। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, ভাইরাস কোন নির্ভেজাল প্রাণী নয়। নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কোন রকম খাদ্য ছাড়াই এরা বছরের পর বছর বেঁচে থাকতে পারে। তখন এদের আচরণ পুরোদস্তুর জড়কণার মতোই। সুতরাং সঠিক অর্থে ভাইরাস নয়, ব্যাকটেরিয়া হল ক্ষুদ্রতম প্রাণী। এককোষজীবী এই প্রাণীদেহে ভাইরাসের মতো কোন বহিরাবরণ নেই। খাদ্য ছাড়া এরা বাঁচতে পারে না। ব্যাকটেরিয়ার আয়তন এক মিলিমিটারের হাজার ভাগ মাত্র।

মৈনাক মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান

—প্রভুতআনন্দদায়কেষু বাণীদা / বাণাদি,
সম্বোধনই প্রকাশ করে কী দিয়েছ তুমি—
নিয়েছ মোদের আপন করে স্নেহ-চুম্বন চুমি।
তোমার বিভাগ জয় করে মন পাঠক ও পাঠিকার,
তাই তো সে আজ এত প্রিয় হল আমাদের সবাকার।
: হরষে পরশে বর্ধমান মৈনাক মুখোপাধ্যায়,
তার ছন্দিত-বাণী-বন্দিত বাণী-নিন্দিত অধ্যায়।

সুপ্রিয় ভট্টাচার্য, কানপুর ৫

—সাধারণতঃ আমরা দুই নাক দ্বারাই নিঃশ্বাস নিয়ে থাকি, কিন্তু প্রশ্বাস ছাড়ার সময় যে কোন একটি নাক

দিয়েই কাজটি সম্পন্ন হয়। একসাথে দুই নাক দিয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ কি অসম্ভব?

: নাকের দুটি ছিদ্র দিয়েই যেমন নিঃশ্বাস নেওয়া হয় তেমনি প্রশ্বাস ছাড়া হয়। তবে ক্রিয়াশীলতার মাত্রা দুটি নাকের সমান থাকে না। কখনও ডান ছিদ্রটি, কখনও বাঁ ছিদ্রটি পর্যায়ক্রমে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর পিছনে অনেক কারণ আছে। গভীর অংশে নাকের ছিদ্রদুটির ব্যাস সমান নয়। এজন্যে অপেক্ষাকৃত বড়টির ক্রিয়াশীলতা স্বভাবতই বেশী। আমাদের ফুসফুসদুটিও পরস্পর অসমান এবং দুটির মধ্যে অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড বর্জনের মাত্রার পার্থক্য আছে। এইসব নানা কারণে নাকের ছিদ্রদুটি একই মাপে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলতে পারে না।

অলোক, অজয় ও শকুন্তলা কোলে, বর্ধমান

—পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু গাছের নাম কী এবং তার উচ্চতাই বা কত?

: উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় রয়েছে সবচেয়ে বড় গাছের অরণ্য। পাতার রঙ লালচে বলে ঐ গাছের নাম রেডউড বা রেডসিডার। সবচেয়ে বড় গাছটির উচ্চতা ৩২৭ ফুট এবং বেড় ৯০ ফুট। এতটা পরিধিও অন্য কোন জাতের গাছের নেই। রেডউড অরণ্যের বয়স পাঁচ হাজার বছরেরও বেশী। কিন্তু যেটা মজার ব্যাপার তা হল, চওড়া পিচঢালা রাজপথের ওপর যে সব রেডউড গাছ আছে তাদের কেটে ফেলা হয়নি। গুঁড়িতে সুড়ঙ্গ কেটে রাস্তা বানানো হয়েছে, তার ভেতর দিয়ে পথিক ও গাড়ী-ঘোড়া যাতায়াত করে। অত বড় বেড় থাকার দরুন গাছের কিন্তু বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে দিব্যি বহালতবিয়তে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে!

নরেশ গুপ্ত (১৯৪৮-৪৯ সালে 'মিঃ রেঙ্গল' ও ১৯৫৬ সালে 'মিঃ স্ট্রংম্যান'), কলিকাতা ২৬

—কিশোর ভারতীতে প্রকাশিত মঞ্জিল সেনের 'এই আধারে' শীর্ষক ব্যায়াম বিষয়ক লেখাগুলি খুব ভাল লাগছে। ভাল লাগছে বিশেষ করে পরিবেশন-নৈপুণ্যের জন্যে। প্রসঙ্গতঃ বলি, নিজেও এককালে ব্যায়াম করতাম এবং বর্তমানেও অভ্যাসটা একেবারে ছাড়িনি। প্রত্যেকের সুন্দর স্বাস্থ্যের জন্যে ব্যায়াম বিশেষ প্রয়োজন। আর সবাই যেখানে বাঙালীর শ্রমবিমুখতা ও অলসতাকে জীবনযুদ্ধে পিছিয়ে পড়ার প্রধান কারণ বলে মনে করছেন, সেক্ষেত্রে তার প্রতিবিধান হিসাবে ব্যায়ামের অবদান তো অতুলনীয়। তাই ব্যায়ামকে অধিক জনপ্রিয় করবার জন্যে এইরকম সরস অথচ ব্যায়ামের নিয়মাবলির নিপুণ বর্ণনাসমৃদ্ধ রচনার বহুল প্রচার কামনা করি।

: শুধু সুকুমারমতি কিশোর-কিশোরীরাই নয়, পরিণত-মনস্ক সমঝদারেরও মন মঞ্জিলবাবু জয় করতে পেরেছেন দেখে আমরা সবিশেষ আনন্দিত।

শৈল গুপ্ত, ঝাড়গ্রাম, মেদনীপুর

—মযুখ চৌধুরী কি ছবির দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে 'অরণ্যের অন্তরালে' আশ্রয় গ্রহণ করেছেন? শারদীয়া সংখ্যায় 'অরণ্যের অন্তরালে' তাঁকে দেখে ভেবেছিলাম, এ বুঝি শিল্পীর সাময়িক মুখ-বদল, কিন্তু অঘ্রান সংখ্যায় পৌষালী সংখ্যার বিজ্ঞাপনে তাঁকে একই জিনিস করতে দেখে এবং সর্বোপরি 'সংখ্যার নাম চার'-এর হতবুদ্ধিকর পরিসমাপ্তি আমার মনে এই ধারণারই জন্ম দিয়েছে যে, একদা-জনপ্রিয় শিল্পী ইদানিং আর হালে পানি পাচ্ছেন না! ঠিক কি?

: এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার অনুচিত।

অরুণ মাহাতো, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর

—বেতারে তো আমরা ইথার তরঙ্গের মারফৎ ঘরে বসে আকাশবাণীর অনুষ্ঠান শুনতে পাই। টেলিভিশনে কিভাবে টেলিভিশন-স্টেশনের অনুষ্ঠান দেখতে ও শুনতে পাব, একটু বিশদভাবে বুঝিয়ে বলবেন।

সেরেছ! বেতার ইথার তরঙ্গ কোথায় শিখলে? বেতার ইথার তরঙ্গ নয়, বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গ (electromagnetic wave)। আলোক তরঙ্গের মতো বেতার তরঙ্গও সেকেণ্ডে প্রায় ১,৮৬০০০ মাইল বেগে চলে। দুরকম তরঙ্গেরই নানা মাপের দৈর্ঘ্য আছে। আলো কিংবা বেতারশব্দ জোরালো হলে তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হয় ছোট, আর কমজোরী হলে তরঙ্গের মাপ হয় বড়। আলোক তরঙ্গ নিজে দৃশ্যমান নয়, প্রতিফলিত বস্তুকেই দৃশ্যমান করে। আর বেতার তরঙ্গ দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়, তা শুধু আমাদের কর্ণগোচরই হয়— তাও যন্ত্রের সাহায্যে, স্বাভাবিক অবস্থায় নয়। কিন্তু বিশেষ এক পদ্ধতিতে বেতার তরঙ্গকে আলোক তরঙ্গের মতোই ব্যবহার করা যায় এবং এর ফলেই সম্ভব হয়েছে টেলিভিশনের জন্ম। বিশেষ সেই পদ্ধতিটি অবশ্য অত্যন্ত জটিল, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার তা এক পরমাশ্চর্য অবদান। ফোটোগ্রাফের মধ্যে থাকে আলো-ছায়ার খেলা। উজ্জ্বল, কম উজ্জ্বল, কম গাঢ় বা বেশী গাঢ় ছায়া প্রভৃতি নানা মাপের শেড থেকে একটি ছবির মধ্যে। টেলিভিশনের পর্দাতেও ছোট বড় নানা মাপের বিদ্যুৎচুম্বকীয় অভিক্ষেপে আলোক-চিত্র ফেলা হয়। যান্ত্রিক জটিলতা অবশ্যই আছে, তবে মূল ব্যাপারটা হল এই। শুধু টেলিভিশনই নয়, আছে বেতার ফোটোগ্রাফিও যার কল্যাণে সুদূর আমেরিকার কোন ঘটনার ছবি কলকাতার সংবাদপত্রে দু-এক ঘন্টার মধ্যেই ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়। ঐ সব ফোটোর নীচে লেখা থাকে 'রেডিও ফোটো' অথবা 'বেতার চিত্র'।

বিদ্যোদয় প্রকাশিত

নীল ঘূর্ণি ৭·৫০ দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অবিস্মরণীয় নীল বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত রক্তে-দোলা-লাগানো জাগরণের বিশাল-কলেবর উপন্যাস **নীল ঘূর্ণি**। "নীল ঘূর্ণি তোমাকে অমর করে রাখবে।"—লেখককে পত্রে জানিয়েছেন **বিমলচন্দ্র ঘোষ**—"বিস্ময়কর উপন্যাস। নীল বিদ্রোহের ইতিহাসকে তুমি তোমার লেখায় জ্বলন্ত রূপ দিয়েছ।...শুধু লেখা নয়, সশস্ত্র বিপ্লব সম্পর্কে তোমার নির্ভুল সুপরিশীলিত দৃষ্টিভঙ্গী আমাকে চমৎকৃত করেছে।...ফকিরদাদু আর কাশীনাথ—এই দুই গুরু-শিষ্যের প্রতীকী চরিত্রদুটি এদেশের লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও মুসলমান কিশোরের মনে বিপুল প্রেরণা জাগাবে।..."

কালের জয়ডঙ্কা বাজে ৫·০০ দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"আড়াই হাজার বছর আগেকার যে কাহিনীটিতে সুদূর অতীতকে তিনি বর্তমানের মত প্রত্যক্ষ বাস্তব করে তুলেছেন, ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে...সকল বয়সের সাহিত্য-রসিকদের তা সমাদরের বস্তু হয়ে উঠেছে।"—বলেন **প্রেমেন্দ্র মিত্র**—"...বাংলা সাহিত্যে যে কটি চরিত্র কোন দিন ভোলবার নয়, তাদের তালিকায় নতুন একটি নাম যুক্ত হল—জীবক।"

অথ ভারত কথকতা ৩·৫০ শ্রীকথকঠাকুর

"...লেখক ছদ্মনামে অবতীর্ণ হলেও তিনি পাকা লেখক। আমাদের দেশের প্রাচীন গল্পভাণ্ডার থেকে...আটটি কাহিনী নির্বাচন করে লেখক কথকতার সুরে গল্প-রস পরিবেশন করেছেন। বইখানি মুখ্যত ছোটদের জন্য, কিন্তু বড়রাও পড়ে খুশি হবেন। গল্প বলার ঢঙই লেখকের স্বচ্ছন্দ কৃতিত্ব।" **আনন্দবাজার পত্রিকা**

ভয়ঙ্করের জীবন-কথা ৪·৫০ দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা কিশোর সাহিত্যে পাঠক-সমাদরের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অপরূপ এই বিজ্ঞান-নির্ভর নিবন্ধ-সংকলনের তিরিশতম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ১৯৬২ সালে অষ্টম শিশু-সাহিত্য-প্রতিযোগিতায় **ভয়ঙ্করের জীবন-কথা** রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্বর্ধিত হয়েছে ॥

বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র সম্পাদনা : দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"...আচার্যের বেশ কয়েকখানি জীবনচরিতই প্রকাশিত হয়েছে, তবু প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে, আলোচ্য জীবনী-গ্রন্থটি নানা কারণই সেগুলির থেকে স্বতন্ত্র।...যেসব বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে, অন্য কোনো জীবন-চরিতে তার সন্ধান মেলে না।...সম্পাদনার সুরুচির জন্য শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশেষ প্রশংসা নিঃসন্দেহে পেতে পারেন।..." **যুগান্তর** ॥ **মূল্য : ৭·০০**

Postal Regn. No. WB/EC 30
সপ্তম বর্ষ N. P. Regn. No. : R. N. 16599/68 চতুর্থ সংখ্যা

প্রকাশিত হল

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

বহুযুগ-প্রতীক্ষিত বর্ণাঢ্য ইতিহাস-নির্ভর উপন্যাস

সাদা ঘোড়ার সওয়ার

চারশ বছর আগে জাতীয় চেতনার প্রথম উন্মেষের উদ্দীপনায় উত্তাল উদ্বেল নদীজপমালাধৃত অখণ্ড গৌড়বাংলা। তারই পটভূমিকায় **সাদা ঘোড়ার সওয়ার** ঐতিহাসিক উপন্যাসে নূতন যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সূর্যকান্ত গুহ, সুখাসর্দার, মুলাজোড়ের চৌধুরীমশাই, নূরউল্লা, সনাতন, রূপরাম, সদানন্দ, রডা, পেড্রো, ডুডলি, শেখর ইত্যাদি অবিস্মরণীয় চরিত্রে বাস্তব ও কল্পনার সমন্বয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের কলমের জাদুতে সেকালের ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ বর্তমানের মত উজ্জ্বল ও জীবন্ত করে তুলেছে॥

মূল্য : ৬·০০

● প্রেমেন্দ্র মিত্রের আরো কয়েকখানি উপন্যাস ও গল্প-সঙ্কলন ●

এক জাহাজ গল্প ঃ ময়ূরপঙ্খী ॥ মকরমুখী ॥ সাগরদাঁড়ী

ছোটদের জন্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র এক অপরূপ কাহিনীর জগৎ গড়ে তুলেছেন। **এক জাহাজ গল্প** এইসব গল্পের তেমহলা রঙমহল। মহল তিনটি হল **ময়ূরপঙ্খী, মকরমুখী** আর **সাগরদাঁড়ী**। নানারসের সতের-আঠারোটি গল্পের মণি-মাণিক্যে প্রতিটি মহলই চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো, সেইসঙ্গে আছে যতগুলি গল্প ঠিক ততগুলি করে পূর্ণাঙ্গ ছবি ও অলঙ্করণ। তার ওপর রয়েছে ঝলমলে রঙিন সব প্রচ্ছদ যেগুলি এঁকেছেন ছোটদের অতিপ্রিয় শিল্পী সূর্য রায়। তিনটি বইয়েরই একেবারে শেষে জগদ্বিখ্যাত ঘনশ্যাম দাস ওরফে ঘনাদা আবির্ভূত তাঁর ওস্তাদী গল্পের গড়াগড়া নিয়ে॥

মূল্য যথাক্রমে : ৭·০০, ৭·০০ এবং ৮·০০

গল্প আর গল্প প্রেমেন্দ্র মিত্রের আরেক জাহাজ গল্পের সংকলন। "প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের বই পরিচিতির প্রতীক্ষা করে না। তিনি শুধু একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও গল্পকার নন ; শিশু-সাহিত্যেও তাঁর দান অসামান্য।...এ গ্রন্থে আটটি গল্প দেওয়া হয়েছে। সব কটিই চমৎকার...আবাল-বৃদ্ধ পাঠকের দল প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিপুণ শিল্পের তারিফ না করে পারবেন না।..." **দেশ॥ মূল্য : ২·৮০**

শুক্লে যারা গিয়েছিল "...নিঃসন্দেহে এ-বই পদে পদে কিশোর-কিশোরীদের কৌতূহলী, চমকিত, বিস্মিত ও সম্মোহিত করবে।...এ-বইয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কল্পনাশক্তির যে পরিচয় রয়েছে তার যথার্থ মূল্য দিতে বয়স্ক বাঙালীদের এগিয়ে আসা উচিত।" **আনন্দবাজার পত্রিকা॥**

মূল্য : ৩·৫০

ড্র্যাগনের নিঃশ্বাস "বিজ্ঞানভিত্তিক ছোটদের রচনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা শিশু-সাহিত্যকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, তেমন আর কারুর রচনায় দেখা যায় না।...এই বইখানি কেবলমাত্র ছোটদের নয়, বড়দেরও পড়ে দেখা উচিত।..." **দৈনিক বসুমতী॥ মূল্য : ২·৮০**

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড॥ কলিকাতা ৯